ভারত আমার
জননী আমার

ভারত আমার জননী আমার

অহীন্দ্রকুমার দে

অমর ভারতী ৮/দি ট্যামার লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮২

প্রকাশক
অধীর পাল
অমর ভারতী
৮সি, ট্যামার লেন,
কলিকাতা-৯

মূল্য ৯.০০ টাকা

মুদ্রাকর :
রামগোপাল মাইতি
লক্ষ্মী প্রেস
১০বি, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

"ধনধান্যপুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

—মায়ের প্রতি সন্তানের যেমন শ্রদ্ধা দেশের প্রতিও মানুষের তেমনি টান। যে দেশে আমাদের জন্ম তাকে বলি জন্মভূমি। এই জন্মভূমি আমাদের জননীর মতো। এজন্যই তাকে বলি মাতৃভূমি বা দেশমাতা। সব দেশের ছেলেমেয়েরাই নিজের দেশকে ভালবাসে। তারা মনে করে তার দেশই সকল দেশের সেরা। তাই আমাদের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' কবি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলেননি। আমাদের দেশের রূপটি একবার কল্পনা করে দেখো—তিনদিকে নীল সমুদ্র উত্তরে তুষারশুভ্র হিমালয়, মাঝখানে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা সমতলভূমি। ভারতবর্ষ যেন আপন সৌন্দর্যে সমস্ত পৃথিবীর মন ভুলিয়েছে। প্রকৃতিদেবীও যেন তাঁর সৌন্দর্য ভাণ্ডার উজাড় করে এদেশে ঢেলে দিয়েছেন। একটিমাত্র দৃষ্টান্তের সাহায্যেই আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, নদী তো সকল দেশেই আছে—কিন্তু কোথায় আছে এমন গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা ?

অতএব আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিভাব জাগ্রত করার মানসে, জন্মভূমির প্রতি ঐকান্তিক প্রগাঢ় নিষ্ঠা গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে এবং উজ্জ্বল অতীতকালের গৌরবময় স্মৃতিগুলির স্মরণ করার জন্য আত্মবিশ্বাস এবং বিজিগীষু মনোবৃত্তির উদ্বোধন করে জীবনের পুণ্যধারাটিকে অক্ষুণ্ণ এবং অটুট রাখার প্রয়োজনের কথাই মনে করে এই গ্রন্থ রচনা।

এই গ্রন্থ পাঠে প্রতিটি পাঠকের অন্তর দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক এই কামনা।

অহীন্দ্রকুমার দে

পূণ্যভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। পূণ্যতীর্থে পরিপূর্ণ এই পূণ্যভুমি দেবতা ও দেব-মানবে বিহারক্ষেত্র। এই ভূমির গ্রামে ও নগরে, পর্বতে ও প্রান্তরে, অরণ্যে ও নদীকুলে কত পুণ্যকাহিনীর অবলেপ, প্রতি ধূলিকণায় কতই না পবিত্র স্মৃতির অভিব্যক্তি। আকাশে-বাতাসে সুদীর্ঘ আধ্যাত্মজীবনের কত মহিমদ্যুতি ও মৃদুলস্পর্শ। ইন্দ্রিয়গত জীবনের ধূলি মলিনতায় দৃষ্টি আমাদের আচ্ছন্ন। দৈনন্দিনতার ক্ষুদ্রতার মাঝে আমরা হারিয়ে ফেলি নিজেকে। ভুলে যাই নিজেদের সত্ত্বাকে। ভুলে যাই আমাদের জন্মভূমির বিরাট ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে।

ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। সাগর মেখলা, হিমগিরি-কুন্তলা, অরণ্য পট্টাম্বরভূষিতা এই ভারতবর্ষ কেবলমাত্র এক ভুমিখণ্ড নয়। ভারতবর্ষের এমনই একটি ভাবরূপ যে, ভাবজীবন সর্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে পেতে চায় জীবনেশ্বরকে। বহুর মধ্যে অন্বেষণ করে একত্বের। অল্পকে পরিত্যাগ করে ভূমার জন্য ক্ষণিকের জন্ম-মৃতু, সংঘর্ষ-শান্তি, আকর্ষণ-বিকর্ষণ সকল দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই শাশ্বত প্রজ্ঞালোকে, যেখানে তিনি আছেন। 'তমের বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি"। সেইজন্য ভারতের মাহাত্মকথা বলতে গিয়ে পুরাণ মুখে ক্রান্তদর্শী ঋষি উদাত্তকণ্ঠে গেয়েছেন—'গায়ন্তি দেবাঃ কিলগিত কানি,

ধণ্যান্তুতে ভারতভুমি ভাগে, স্বর্গাপবর্গ মার্গভুতে, ভবন্তি ভুয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।"

বহির্দৃষ্টিতে ভারত শতধা বিছিন্ন হলেও এক অখণ্ড ভারতের সন্ধান পাব তার তীর্থধর্মের দৃঢ়বন্ধনের মধ্যে।

মহাতীর্থ এই ভারত—তীর্থস্থান ও পবিত্রস্থান। ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বদিকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। ভারতের চারিটি ক্ষেত্র মুক্তি বরাহ হরিহ ও কুরু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। ভারতের চার প্রান্তের চারিটি শক্তিপীঠ জ্বালামুখী কন্যাকুমারী কামাক্ষী হিংলাজ যথাক্রমে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিষ্ঠিত। প্রধান তিনটি সূর্য্যমন্দির একটি কোণারকে অর্থাৎ পূর্বদিকে, দ্বিতীয়টি মুলতানে অর্থাৎ উত্তরদিকে এবং তৃতীয়টি সুরাটে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ভারতের পৃথক পৃথক স্থানে ছড়িয়ে আছে গণপতির আটটি পীঠস্থান। শিবপূজার প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রগুলিও ভারতের চতুর্দিকে অবস্থিত। ভগবান বিষ্ণুর অধিষ্ঠিত স্থান হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থান পবিত্রকৃত। দেবী সতীর ছিন্ন দেহখণ্ডে বাহান্নটি পীঠস্থান অবস্থিত। এইসব পুণ্য পীঠস্থানের সংগে যুক্ত হয়েছে ভারতের পবিত্র সাতটি পর্বত, চারিটি সরোবর এবং মোক্ষদায়িণী পবিত্র নদী। অগণিত পীঠস্থান, তীর্থস্থান সমাকীর্ণ এ ভুমির নাম তাই সার্থক।

পুণ্যভুমি ভারত সত্য-সত্যই তীর্থময় ভারত। ভগবান সপার্ষদ যুগে যুগে এদেশের নানাস্থানে লীলা করে গেছেন। তাঁর চরণ রেণুপূতঃ সেসব লীলাভূমি কালক্রমে অগণ্য তীর্থে পরিণত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিটি স্থানেই তীর্থ মন্দির,

পীঠস্থানাদি বিরাজমান। একটিমাত্র দেশে এত অসংখ্য পবিত্রভূমির অবস্থান—এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে সত্যিই বিরল।

শত তীর্থময় ভারত! তার পথে-প্রান্তরে ধুলার অন্তরে সংগোপনে রয়েছে কত-না মহাপুরুষের পদচিহ্নরেখা, তার বাতাসে আছে অবিনাশী অদৃশ্য তড়ীৎকণায় ধুয়ে যাওয়া কত-না আহ্বান! সে আহ্বান কি মহাশূন্যে এমনি ঘুরে বেড়াবে নিরাবলম্বণ?

মুক্ত অন্তরে চলে পথিককে আকর্ষণ করে আনতে, নিরাবলম্বন সেই আহ্বানবাণীকে নিজের অন্তরে পেঁছিতে ভারতের মর্মস্থলে। নূতন আবিষ্কার করতে সভ্যতার মহারণ্যে হারিয়ে যাওয়ার সভ্যতার আদিম-ধাত্রীকে—ভারতবর্ষকে।

মাটিরতলায় বীজের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে অনাগত অরণ্যের বনস্পতি তেমনি লুকিয়ে আছে আজকের এই ভগ্ন-সৌধ লুপ্তকীর্ত্তি শতাব্দীর ধূলির অন্তরালে, অনাগত ভারতের অবিনাশী দিব্যসত্ত্বা। দেশের মাটির মর্মে গিয়ে আনতে হবে সংবাদ, নিজের হৃদস্পন্দন দিয়ে অনুভব করতে হবে মহাভুমির হৃদস্পন্দন সর্বইন্দ্রিয় দিয়ে বলতে হবে, তোমাকে জেনেছি, তোমাকে চিনেছি, পেয়েছি তোমাকে। হে আমার অবিনাশী সত্ত্বা, হে আমার সনাতন স্বদেশ!

এই গীতি আলেখ্যের মধ্যদিয়ে আমরা তাই সুরু করতে চাই আমাদের সেই তীর্থ পরিক্রমা, এক তীর্থ ছেড়ে আরেক তীর্থে গমন। এরই মধ্যে দিয়ে আমরা চিনে নিতে চাই আমাদের দেশের অবিনাশী অখণ্ডসত্ত্বাকে।

হিমালয়

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবত্মাতা হিমালয়ো নাম নাগাধিরাজা।
পূর্বাপরৌ তয়োনিধি বগাহ্যস্থিত প্রতিষ্ঠামিব মানদণ্ডঃ ॥

মহাকবি কালিদাস হিমালয়কে বলেছেন "দেবতাত্মা।" সমগ্র হিমালর পর্বত জুড়ে অসংখ্য পবিত্রস্থানগুলো পরিদর্শন করার পর একথা মানতেই হবে যে হিমালয়ের "দেবত্মাতা" নাম সার্থক। হিমালয়ের কৈলাশ-শিখর, কেদারনাথ ক্ষেত্র, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার প্রভৃতি অজস্র দেবমন্দিরগুলি মহান তীর্থরূপে আজও বিরাজিত। এই হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আমাদের হিন্দুজাতীর শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসমূহ। নিস্তব্ধতা, শান্তি আর ধ্যানশীলতার মূর্তিমান প্রতীক হয়ে ভারতের উত্তরে বিশাল সমুন্নত এই হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে মহাযোগীর মত যুগ যুগ ধরে। এই হিমালয় অনাদিকাল হতে ভারতবাসীর হৃদয়ে এনেছে অসীমআনন্দ, অদম্য প্রেরণা আর অটল নির্ভীকতা—শত বাধাবিপত্তির মাঝখানে আপনলক্ষে স্থির থাকার সুদৃঢ় সঙ্কল্প।

কৈলাস

হিমালয়ের বুকে প্রায় ১৭০০০ (সতের হাজার) ফুট উঁচুতে চির তুষারাবৃত কৈলাস একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। পাশেই ছোট ছোট আরও শিবলিঙ্গ দণ্ডায়মান। মনোমুগ্ধকর কৈলাস-পতির দর্শনে দেহমনে জাগে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ। কৈলাসের চারিদিকে চারিটি গুম্ফা—দক্ষিণে টারচান, পশ্চিমে নিয়ানুড়ি, উত্তরে ডিরিফুক ও জুন্‌থুলফুক। পশ্চিমে, উত্তরে

এবং পূর্বে ছোট ছোট নদী। চিরতুষারাবৃত এই কৈলাস পর্বতে যখন চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ে তখন কোন এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে আপ্লুত হয়ে উঠে হৃদয়-মন। সামনে ছয় মাইল দূরেই রাক্ষসতাল বা রাবণহ্রদ।

পুরাণে আছে রাবণ শিবের পরম ভক্ত। রাবণের বাসনা—কৈলাসসহ মহাদেবকে লংকায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। আশুতোষ সন্তুষ্ট হয়ে রাবণকে সম্মতি জানিয়ে বর দিলেন। তবে সর্ত রাখলেন ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে কৈলাসশিখরে উপস্থিত হলে তার বাসনা পূর্ণ হবে। কিন্তু রাবণ সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে অসমর্থ হলেন। ভুলক্রমে সূর্যোদয়ের পর কৈলাসশিখরে গিয়ে হাজির হন। বাক্য রক্ষা করতে না পেরেও ক্রোধপরবেশে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কৈলাসপতিকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন। কৈলাস দুলতে থাকে ভীষণ শব্দে। কৈলাস পর্বতের পাথরগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পার্বতী ভীতা হয়ে শিবকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "দেব, হঠাৎ এ বিপদ কেন ?" দেবাদিদেব সবই জানতেন। তিনি ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা সামান্য চাপ দিলেন। তাতেই রাবণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন।

অক্লান্ত পরিশ্রমে রাবণের শরীর থেকে যে ক্লেদ নির্গত হয় তাই দিয়ে সেখানে একটি হ্রদের উৎপত্তি হয়। বিফল মনোরথ হয়ে রাবণ আবার ঘোর তপস্যায় রত হন। আশুতোষ সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়ে বলেন, "তোমার শক্তির পরিচয় পেয়ে

আমি সন্তুষ্ট।" যতদিন কৈলাস থাকবে ততদিন এই হ্রদও 'রাবণ হ্রদ' নামে খ্যাত হবে।"

বদরিকাশ্রম

গৌরীশৃঙ্গের বামদিকে বদরিকাশ্রম প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মহাভারত রচয়িতা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবের আশ্রমভূমি।

মানস সরোবর

হিমালয়ের বুকে সৃষ্টি হয়েছে এই পবিত্র সরোবর। সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে ভারতের দুটি প্রধান ও প্রাচীন নদী সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র।

রুদ্রপ্রয়াগ

রুদ্রপ্রয়াগে রুদ্রনাথের মন্দির বিখ্যাত। জাগ্রত দেবতা রুদ্রনাথ। প্রয়াগে যাঁরা স্নান করেন, রুদ্রনাথ শিবের নিকট পূজো দিয়ে তাঁরা তাঁদের তীর্থযাত্রার পুরো ফলশ্রুতির আশ্বাস নিয়ে ফিরে যান। কেদারনাথ তীর্থের প্রবেশ দ্বারে রুদ্রনাথ। শ্রীনগর থেকে হাঁটা পথে রুদ্রপ্রয়াগ মাত্র এগার মাইল। রুদ্রপ্রয়াগের দেবতা রুদ্রনাথশিব। একসময়ে দেবর্ষি নারদ এখানে এসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন রুদ্রনাথের দর্শন লাভের জন্য। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনায় তুষ্ট হয়ে রুদ্রনাথ দেবর্ষি নারদের সামনে এসে দর্শন দিলেন। সেই থেকেই এখানে রুদ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত।

এখানকার পূজারী তীর্থযাত্রীদের দেখলেই ডেকে বলেন, এসো রুদ্রনাথের বিভূতি মাখিয়ে নাও কপালে। রুদ্রনাথ ও কেদারনাথ স্থানভেদেই কেবল আলাদা নাম। নইলে সবই

এক। বলেন, গুরু আজাও, গুরু আজাও—ইধর বৈঠো। তোমহারে অন্দরমে জীবাত্মা, আওর উনকো অন্দরমে পরমাত্মা। উনকো বোলি কিয়া মালুম "হৈ কুছ"? বলেই হেসে উঠেন পূজারী। ভুলে গেছো গুরু, বেমালুম ভুলে গেছো। না, না তোমার দোষ নেই। সংসারের মায়া-মোহ সব কিছু তোমার মনকে ভুলিয়ে রেখেছে। সবই মায়া। এই মায়ার বাধন কাটাবার জন্যই সংসার ছেড়ে চলে আসা, কৃচ্ছুসাধন করা। লেকিন, পরামাত্মার কৃপা না হলে সবই ব্যর্থ। জানতো—

"ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য
ন মেধয়া বহুনাশ্রুতেন।"

কর্ণপ্রয়াগ

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে কর্ণপ্রয়াগ বাস রাস্তা ২১ মাইল। এই কর্ণপ্রয়াগে পিণ্ডার গঙ্গা এসে মিলেছে অলোকানন্দার সঙ্গে। অলোকানন্দার নীলাভ জল আর পিণ্ডারের ঘোলাটে জল দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। পিণ্ডার গঙ্গার আরেক নাম কর্ণগঙ্গা। কর্ণগঙ্গার তীরে বেশ বড় শীলাখণ্ডের উপরে একটি জীর্ণমন্দির। ঐ মন্দিরে রয়েছে কর্ণ ও তার মহিষী পদ্মাবতীর পাথরের মূর্তি। পদ্মাবতীর মূর্তি দেখে মনে হয় পতিপ্রাণা। মহিষী সর্বক্ষণ স্বামীর সাথে থাকতেন। শোনা যায়, কর্ণ তাঁর মহিষীকে নিয়ে চলে যান কৈলাসে। সেখানে হরপার্বতীর দর্শন লাভ করেন। যে শীলাখণ্ডের উপরে মন্দির তার নাম কর্ণশীলা। এই শীলাখণ্ডের উপরে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন কর্ণ। তখন অলকানন্দা ছিল অনেক দূরে।

তপশ্চর্যার স্থান থেকে উঠে অত দূরে গিয়ে স্নানাদি ক্রিয়া করা ছিল আয়াসসাধ্য। এতে তপশ্চারণের ব্যাঘাত ঘটতো। তাই হয়ত ভগবান ভক্তের জন্য গঙ্গাধারা নিয়ে এসেছিলেন কর্ণশীলার কাছে। পিণ্ডার গঙ্গার অন্য নাম কর্ণগঙ্গা সম্ভবত এই জন্যই। মন্দিরের কাছে কর্ণকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড। কোন এক সুদূর অতীতে কর্ণের সামনে এসে দর্শন দিয়েছিলেন সূর্য্যদেব। অক্ষয় কবচকুণ্ডল দান করেছিলেন কর্ণকে। আবার এইখানেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের নিকট এসে ভিক্ষা চেয়েছিলেন সেই অক্ষয় কবচকুণ্ডল।

নন্দপ্রয়াগ

পঞ্চপ্রয়াগের একটি হল নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দা ও নন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। নন্দাকিনী এসেছে কুমায়ুনের ত্রিশুলের পাদদেশে। শৈলসমুদ্র হিমবাহ থেকে। নন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলের একটু আগেই চণ্ডীকাদেবীর মন্দির। এছাড়াও আছে যশোদা গোপালজী কৃষ্ণবলরাম ও বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির। লক্ষীনারায়ণ ও নন্দরাজার মন্দিরও রয়েছে অনতিদূরে। শোনা যায়, নন্দপ্রয়াগেই ছিল কণ্বমুনির আশ্রম। কণ্বমুনির আশ্রম ছিল বলেই হয়ত নন্দপ্রয়াগের অন্য নাম কণায়ু।

জ্যোতিমঠ

ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত হিমালয়ের নিভৃত নির্জনে এই প্রসিদ্ধ জ্যোর্তিমঠ। শঙ্করাচার্যের জীবনীতে এই মঠের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এখানে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা

করেছিলেন। আজকের যোশীমঠের ভেতরে খুঁজে বার করতে হয় সুদূর অতীতের এই জ্যোতির্মঠকে। তখন এক মহাযুগ-সন্ধীক্ষণ। একদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে লুপ্ত প্রায় হিন্দুধর্ম, অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম অবনতিরধারা বিপর্যস্ত করে তুলতে সুরু করেছে জনসাধারণের ধর্মীয় ও সমাজজীবন। কথিত আছে, মহর্ষী বেদব্যস শঙ্করাচার্যকে দর্শন দিয়েছিলেন এই জ্যোর্তিমঠে। তাঁরই আদেশক্রমে ভগবান শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চারিদিকে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। এই মঠগুলির মধ্যে সর্বোত্তরে প্রধান ও আদিমঠ, জ্যোর্তিমঠ। দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধে স্থাপিত হয়েছিল 'শৃঙ্গেরী মঠ'। পূর্বে পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন মঠ। আর পশ্চিমে দ্বারকার সারদা মঠ। এই চারিটি মঠ একদিকে যেমন ভারতবর্ষের ঐক্যবিধায়ক তেমনি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হিসাবেও পরিগণিত।

দেবপ্রয়াগ

কেদারবদরী পথের তোরণদ্বারে দেবভূমি দেবপ্রয়াগ। হিমালয়ের তীর্থপথে দেবপ্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম। দেবপ্রয়াগ পুণ্যার্থীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। পথের চিন্তা ভুলে যারা পথে চলে তাদের ডেকে বলে এসো এই দেবভূমে। তুমিতো মর্ত্তের মানুষ। জানো, মনুষ্যরূপী ভগবান রামচন্দ্র এসেছিলেন এইখানে তপস্যা করতে। সে কোন্ যুগের কথা! ভগবান রামচন্দ্র বসলেন অযোধ্যার সিংহাসনে। চতুর্দশ বৎসর বনবাস থেকে ফিরে এসে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ

করেও তাঁর মনে শান্তি নেই। তিনি বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্রকে ও তাঁর বংশধরদের হত্যা করেছেন। তাই ব্রহ্মবধের পাপে তাঁর দেহমন জর্জরিত।

রাজগুরু বশিষ্ঠ উপদেশ দিলেন, ভাগীরথী ও অলোকানন্দার সঙ্গমস্থলেই দেবভূমি দেবপ্রয়াগ। সেখানে তপস্যা করলেই ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্তি। রামচন্দ্র দশ অবতারের অন্যতম অবতার। নররূপী নারায়ণকেও ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করেছিল। যার জন্য সুদুর অযোধ্যা থেকে তাঁকে পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছিল দেবপ্রয়াগে। লছমনঝোলার কাছাকাছি রাম-লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের মান্দরের অবস্থানের কথা ভাবলেই মনে হবে রামচন্দ্র কেদারবদরীর হাঁটা পথ ধরেই এখানে এসেছিলেন। এই দেবপ্রয়াগেই রঘুনাথজীর মন্দির।

রঘুনাথজীর মন্দিরের উপরেই ক্ষেত্রপালের মন্দির। মন্দিরের পাশেই ছোট্ট একটি ঝর্ণা যার নাম শান্তা। এই ঝর্ণা যে পাহাড় থেকে এসেছে সেই পাহাড়টির নাম দশরথ পর্বত। অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের নামানুসারেই এই নাম। সে আরেক কাহিনী শোনা যায়। মহারাজ দশরথ এইস্থানে এসেছিলেন মৃগয়ায়। এই শান্তার জলধারা থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে এসেছিল অন্ধকমুনির একমাত্র সন্তান সিন্ধুক। কলসীতে জলভরার শব্দ বহুদূর থেকে শুনেছিলেন দশরথ মহারাজ। তিনি ভেবেছিলেন হয়ত কোন মৃগশিশু ঝর্ণার জল পান করছে। তাই তিনি শব্দ লক্ষ্য করে আড়াল থেকে ছুঁড়েছিলেন শব্দভেদী বাণ। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদে ভরে

গিয়েছিল দশদিক। সেদিন হয়ত দশরথ দেখেছিলেন, এ স্বচ্ছজলধারার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে— ভাগীরথীর জলে। এই ঘটনা যদি এখানেই ঘটে থাকে তাহলে সেই ঘটনার খেসারত শুধু মহারাজা দশরথই দেননি নিজের জীবন দিয়ে তাঁর পুত্র রামচন্দ্রকেও দিতে হয়েছিল। তার সাক্ষী দেবভূমি দেবপ্রয়াগের রঘুনাথজীর মন্দির।

বিষ্ণুপ্রয়াগ

ধৌলিগঙ্গা ও অলোকানন্দার মিলনস্থলে বিষ্ণুপ্রয়াগ। ধৌলির আরেক নাম বিষ্ণুগঙ্গা। উচ্ছলজলপ্রবাহ ধৌলির শান্ত সমাহিত নীলাভ জল অলকানন্দার। সঙ্গমস্থলের উপরে বিষ্ণু মন্দির। রাণী অহল্যাবাই বিষ্ণুপ্রয়াগের মন্দিরগুলো সংস্কার-সাধন করেন। সেই পুণ্যবতী মহিলা পদব্রজে ঋষিকেশ থেকে এসেছিলেন এখানে। সমস্ত পথঘাটের তিনি সংস্কারসাধন করে পুণ্যার্থীদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে রয়েছেন।

হেমকুণ্ড

গুরুগোবিন্দ সিং পূর্বজন্মে হিমালয়ে একযুগ ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর সেই তপস্যার স্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে আত্মচরিত "বিচিত্র নাটকের" অষ্টম অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

অবমৈ আপনি কথা বখানী
তপসাধিত যেহ বিধমোহে আপনি।
হেমকুট পর্বত হৈ যাহা
শাপত্ শৃঙ্গ শোভিত হৈ তহা।

শপত্ শৃঙ্গ তিহি নাম কহাবা
পাণ্ডুরাজা যাহা যোগ কমাবা ॥
তাহা হম অধিক তপস্যা সাধি
মহাকাল কালকা আরাধি।
এহি বিধি করত তপস্যা ভয়ো
দ্বৈতে একরূপ হৈব গয়ো ॥

পাণ্ডুরাজা হিমালয়ে তপস্যা করতে এসেছিলেন সুদুর অতীতে। পাণ্ডুকেশ্বরের সঙ্গে মহাভারতের যুগের যোগসূত্র ছিল। কিন্তু কোথায় সেই শাপতশৃঙ্গ, যেখানে পাণ্ডুরাজা তপস্যারত ছিলেন। যেখানে পরবর্তীকালে গুরুগোবিন্দ সিংও একযুগ ধরে তপস্যা করেছিলেন? মহাভারতের আদিপর্বে ১১৩ অধ্যায়ে পাণ্ডুরাজার তপশ্চারণ ভুমির বর্ণনা রয়েছে। সেখানে আছে, নাগশত চিত্ররথ, কালকুট পর্বত যেগুলো পেড়িয়ে হিমবন্ত অতিক্রম করে গন্ধমাদন পর্বতে এসে পেঁৗছে-ছিলেন মহারাজ পাণ্ডু। তারপর হংসকুট অতিক্রম করে এসে-ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম সরোবরের তীরে। যেখানে শতশৃঙ্গ পর্বত তপস্বীদের তপশ্চারণ ভুমি; পাণ্ডুরাজা যেখানে কঠোর তপস্যা করেছিলেন দীর্ঘকাল। গুরুগোবিন্দ সিং-এর সাধন ক্ষেত্র পাণ্ডুকেশ্বর থেকে খুব বেশী দুরে নয়। কারণ পাণ্ডুরাজা পাণ্ডুকেশ্বর পেড়িয়ে বহুদুর কোথায় গিয়েছিলেন এর কোন কাহিনী প্রচলিত নেই। পাণ্ডুকেশ্বর অলকানন্দার তীরে। অলকানন্দার সঙ্গে এসে মিশেছে ভুইন্দার গঙ্গা। এই পথেই লক্ষ্মণ এসেছিলেন তপস্যা করতে। এইখান থেকেই বেড়িয়েছে

একটি সরু পথরেখা। সেই পথরেখা গিয়ে মিশেছে দুর্গম পাহাড় আর গভীর বন পেড়িয়ে এক সরোবরের তীরে। সরোবরের তিনদিকে তুষারধবল সাতটি পর্বতশৃঙ্গ।

"শাগত শৃঙ্গ শোভত্ হৈ তহা।" এই সরোবরই হল পরবর্তী-কালে হেমকুণ্ড। হেমকুণ্ডের তীরে ছোট্ট জীর্ণ মন্দির। গোবিন্দঘাটের গুরুদ্বার নির্মিত হল এখানেই। এই হেম-কুণ্ডেই গুরুগোবিন্দ সিং তপস্যা করেছিলেন পূর্বজন্মে। সত্য-নাম, সত্যনাম সত্যনামজী।

কেদারনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একপ্রান্তে যেমন অমরনাথ তেমনি অপরপ্রান্তে বদ্রীবিশাল। অগণিত হিন্দু অনাদিকাল থেকে জীবনপণ করার পথশ্রমকে অগ্রাহ্য করে আসেন কেদার বদ্রীনাথের চরণস্পর্শ লাভে, নিজেকে ধন্য করতে। চলার পথে কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হয় রুদ্র জ্যোতির্লিঙ্গের মহাসঙ্গীত। এই জ্যোতির্লিঙ্গই হল ভগবান শঙ্করাচার্যের সমাধিস্থল।

পঞ্চকেদার

দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রসিদ্ধ তীর্থ কেদারবদ্রী। ভারতের সকল অংশ থেকে হাজার হাজার যাত্রী আগমন করে এই প্রাচীন তীর্থে। কিন্তু এরই উত্তরাখণ্ডে পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদরী আছেন সেকথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর—সর্বপাপহর এই পাঁচটি তীর্থস্থানেরই মিলিত নাম হল পঞ্চকেদার। দুর্গম এই পঞ্চকেদার অভিযাত্রার পথ। বড়ই পথের গোপন রহস্য ও

নিভৃতির পরমশান্তি এখনো রক্ষা করে চলেছেন পঞ্চকেদার। সভ্যতার যানবাহন আজও সেখানকার মন্দিরদুয়ারে পৌঁছুতে পারে নি।

গঙ্গা

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে
শংকর মৌলী নিবাসিনী বিমলে
মম মাতরাস্তাং তব পদকমলে ॥

সেই প্রথমদিনের কথা। ভগবান বিষ্ণুর আদেশে গঙ্গা সেদিন আকুল হয়ে বলেছিলেন—সেকি প্রভু, আমাকে মর্ত্যে যেতে হবে? মর্ত্যের যত পাপীতাপী আমাকে স্পর্শ করে মুক্ত হয়ে আসবে বৈকুণ্ঠে?

ভগবান বিষ্ণু স্মিতহাস্যে বলেছিলেন—হ্যাঁ, দেবি!

—আমি মর্ত্যের সমস্তপাপ ধারণ করে মর্ত্যেই বাস করব? একি আদেশ প্রভু? আমি পাপ থেকে মুক্ত হবো কিসে?

ভগবান বিষ্ণু বললেন—তোমার দেহে তো কোন পাপ থাকবে না। কারণ তোমার জলে একজন বৈষ্ণবও যদি অবগাহন করেন তবে তাঁরই স্পর্শে তুমি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবে। তুমি ত্রিভুবনে খ্যাত হবে পতিতপাবনী নামে। তুমি চির নির্মল, চিরপবিত্র।

হৃষ্টমনে গঙ্গা চলে এলেন অমর্ত্যের পথ বেয়ে মর্ত্যে। তাঁর এই মর্ত্যলোকের যাত্রার বন্ধুর পথকে ভেঙ্গেচুরে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে নিলেন। হরিদ্বার এই মর্ত্যলোকের শুরু। অমর্ত্যের

কিশোরী গঙ্গা এখানে যৌবন-লাবণ্যবতী। হরিদ্বার ছাড়িয়ে গঙ্গা মর্ত্যভূমিতে সুখদা, বরদা, মাতৃমূর্তি। সুমেরু পর্বতের কাছে অলোকানন্দা, মন্দাকিনী, ভোগবতী ও ভাগীরথী। এই চারিটি ধারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে গঙ্গা এলেন মর্ত্যে। মর্ত্যভূমে অমর্ত্যের পূতপবিত্র জলধারা বহে চলেছে সাগরের দিকে। তার গতিপথে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনপথ, গড়ে উঠেছে সভ্যতা। উষর মরুভূমি প্রাণ পেয়েছে। সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ সগরসন্তান শুধু মুক্তিলাভ করে নি, ব্রহ্মশাপ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষও প্রাণ পেয়েছে। বিচিত্র ফল ফুল আর শস্যসম্ভারে সাজিয়ে দিয়েছেন গঙ্গা লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষের মর্ত্যলোককে।

এই গঙ্গা সুরেশ্বরী। পরমাবতী! কূলে তার মগ্ন তপস্বী। গঙ্গা শুধু গঙ্গা নয়, নয় শুধুমাত্র একটি নদী। গঙ্গা ভারতাত্মার নর্ম-মর্মর আলোকনন্দা। তার উপলব্ধি সাগর-মন্থন-উদ্ভূতা বিভূতি। এই গঙ্গাকে জানলে ভারতকে জানা হয়ে যায়। গঙ্গাপ্রবাহে ওঙ্কারময় নির্ঘোষে সর্বকালের সর্বজিজ্ঞাসার উত্তর। তার গৈরিকতায় সকলের প্রতি একই নির্দেশ—'তপস্তপস্ত'। তার গ্রসিষ্ণুতায় বিভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের আদর্শ। তার পল্লবায়নে বিশ্বমানবের মঙ্গল-নিধান। তার স্থিতিতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাই গঙ্গা—তীর্থানাং পরমতীর্থ।

হরিদ্বার

কাশী কাঞ্চীচ মায়াখ্যাত্বযোধ্যাদ্বারবত্যপি
মথুরাবন্তিকাচৈতাঃ সপ্ত পুর্যোজত্র মোক্ষদাঃ।

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে সাতটি পুরীর সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। কাশী, কাঞ্চী, মায়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা এবং অবন্তিকা—এই সাতটি পুরী মোক্ষদায়িনী। এই পুরীগুলি দর্শন করলে মোক্ষ লাভ হয়। হরিদ্বার, কন্‌খল্‌ ও হৃষিকেশ প্রভৃতিকে মায়াপুরী বা মায়াক্ষেত্র বলা হয়। পুরাণে মায়াক্ষেত্রের বিস্তৃতি বারোযোজন। এখানেই দক্ষযজ্ঞে সতী শিবের নিন্দা হেতু দেহত্যাগ করেন শিব সতীর মৃতদেহ কাঁধে করে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান। বিষ্ণুর সুদর্শন দিয়ে সতীর

মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করেন। তখন সতীর জঠর এই হরিদ্বারে পড়ে। একারণেই একে একান্ন মহাপীঠের একপীঠ বলা হয়। মহামায়া স্বয়ং সতীরূপ ধারণ করে এই ক্ষেত্রেই জন্মগ্রহণ করেন। এই মহামায়ার নামানুসারেই এই পুরীর নাম হয় মায়াপুরী।

হরিদ্বারা কুষাবর্তে নীল্লকে বিল্বপর্বতে।
কনখলেতু ক্বতস্নানে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হরিদ্বারে, কুষাবর্তে নীলধরায় ও কনখলে স্নান ও বিল্বকেশ্বর শিবের দর্শনে মানবের পুনর্জন্ম হয় না।

হৃষিকেশের অশান্ত উচ্ছল গঙ্গা হরিদ্বারে অপেক্ষাকৃত শান্ত। হরিদ্বারেই গঙ্গার অবতরণ সমতলভুমিতে। স্ব:র্গের শেষ সীমানা হৃষিকেশ। এইখানে এসে গঙ্গা থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এইখান থেকে তিনি দেখেছিলেন মর্ত্যভুমি। এবার তাকে মর্ত্যভূমে অবতরণ করতে হবে। নাহলে কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত সগর সন্তানদের মুক্তিলাভ ঘটবে না। কিন্তু কেমন করে অবতরণ করবেন মর্ত্যভূমে? তার তীব্রবেগ ধারণের ক্ষমতা একমাত্র মহেশ্বর ছাড়া কারো নেই। পৃথিবী কেমন করে তার বেগ ধারণ করবে? ভগীরথকে জানালেন দেবী—দেবাদিদেব মহাদেব যদি জটাজাল বিস্তার করে তার বেগ ধারন করেন তাহলেই মর্ত্যে অবতরণ করা সম্ভব হবে।

আবার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট করতে হল মহাদেবকে। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর তার বিশাল জটাজাল বিস্তার করে ধারণ করলেন গঙ্গার অশান্ত জলরাশি। কিন্তু মহাদেবের জটা যেমন বিশাল তেমন দুর্গম। সেই দুর্গম জটাজালের ভেতরেই পথ হারিয়ে গঙ্গা ঘুরে বেড়াতে থাকলেন দীর্ঘকাল। ব্যাকুল হলেন ভগীরথ। তার কঠোর তপস্যার একি ফল? মর্ত্যলোকে ঋষিবর কপিলের অভিশাপে ভস্মীভূত তার পিতৃ-পুরুষ। তাদের অভিশপ্ত আত্মার মুক্তি হবে কি করে? গঙ্গার অহঙ্কার ও দর্প চূর্ণ করে মহেশ্বর ভগীরথের আকুল প্রার্থনায় মুক্ত করে দিলেন জটাজাল থেকে গঙ্গাকে। স্বর্গ থেকে গঙ্গা

অবতরণ করলেন মর্ত্যে, হৃষিকেশ থেকে হরিদ্বারে। সেই দিন থেকেই হরিদ্বারের আরেক নাম হল "গঙ্গাদ্বার"। মায়াপুরী ও গঙ্গাদ্বার এই উভয় স্থানকেই হরিদ্বার বলা হয়। এই হরিদ্বারই আবার হরিকী পেড়ী বা হর পৈড়ী। হিন্দীভাষায় সিঁড়িকে পৈড়ী বলে। হরি বা হরের দর্শনলাভ করতে হলে হিলালয়ের প্রথম সিঁড়ি এইস্থান থেকেই শুরু।

ব্রহ্মকুণ্ড

এই ক্ষেত্রের প্রধান ও মুখ্য তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির। কথিত আছে, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে মর্ত্যে, নিয়ে আসেন তখন এখানে মহারাজ শ্বেত তপস্যা করছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হলেন ব্রহ্ম। তিনি মহারাজ শ্বেতকে দর্শন দিয়ে বললেন, 'রাজা, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট। বল তুমি কি বর চাও?' রাজা শ্বেত যুক্ত করে বললেন, প্রভু, আমি একটি বর শুধু প্রার্থনা করবো—এই আশ্রমের সমস্ত ভূমি তপস্বীব্রাহ্মণদের। আমি প্রার্থনা করিএই আশ্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু. মহেশ্বর ও গঙ্গা নিত্য বিরাজ করুন। আর এই স্থানটি আপনার নামেই পরিচিত হউক।

ব্রহ্মা বললেন 'তথাস্তু'।

তাই এই স্থানটির নাম ব্রহ্মকুণ্ড। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সমদম্প্রায়ের লোকেরাই এতে অবগাহন করে নিজেদের মুক্তি কামনা করে। এই হল ব্রহ্মকুণ্ডের বিশেষত্ব। কেদার বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর যাত্রীরা নিজেদের অভিষ্ট লাভার্থে

এই কুণ্ডে স্নান করে পবিত্র হয়ে ভগবানের দর্শন মানসে যাত্রা করেন। এর তিনদিকে হিমালয়। এইস্থান থেকে হিমালয়ে অভাবনীয় অপূর্বদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জগতের মধ্যে এক অতুলনীয় মনোরম স্থান এই ব্রহ্মকুণ্ড। নিকটেই পতিতপাবনী গঙ্গার অপূর্ব শোভা নয়নমনকে চিরশান্তি দান করে। ব্রহ্মকুণ্ডের সন্ধ্যা আরতি এক অপূর্ব দর্শনীয় বস্তু। ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্বদিকে নীলপর্বত। পর্বত শিখরে চণ্ডীদেবীর মন্দির।

কুশাবর্ত ঘাট

ব্রহ্মকুণ্ড থেকে অল্প দূরেই কুশাবর্ত ঘাট। কথিত আছে—এখানে মহামুনি দত্তাত্রেয় দশহাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন। একবার তিনি যখন সমাধিতে মগ্ন, গঙ্গার উচ্ছল জলপ্রবাহ তাঁর কোশাকুশী ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ধ্যানভঙ্গের পর দত্তাত্রেয় তাঁর কোশাকুশী না পেয়ে দেখলেন অদূরে গঙ্গা স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ক্রোধান্বিত দত্তাত্রেয় গঙ্গাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত দেখেই দেবতাগণ তাকে তুষ্ট করলেন। দেবতাদের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে দত্তাত্রেয় বললেন—এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে আপনারা সকলে অবস্থান করুন। আর যেখানে আমার কোশাকুশী ভেসে গিয়েছে সেখানটার নাম হউক কুশাবর্ত। এইখানে মানবগণ অবগাহন করে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করলে আর যেন তাদের পুনর্জন্ম না হয়। কুশাবর্ত ঘাটের কাছে সেতু দিয়ে গঙ্গার ওপারে যাওয়া যায়। সেখান থেকে নীল ধারায় যাওয়ার পথ।

কন্‌খল্‌

হরিদ্বার থেকে মাইল দেড়েক দূরে কন্‌খল্‌। কন্‌খল খুব বেশী প্রাচীন নাম নয়। এইস্থান পৌরাণিক যুগের দক্ষপুরী। কথিত আছে, দক্ষপুরীতে কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। তখন সেখানে ধর্মকেতু নামে এক খল ব্যক্তি এসেছিল ব্রাহ্মণদের ধনরত্ন অপহরণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে ও শাস্ত্র আলোচনা শুনে তাহার জ্ঞান হয়। তখন ধর্মকেতু ব্রাহ্মণদের উপদেশ অনুযায়ী দক্ষঘাটে গঙ্গায় স্নান করে শিবের অর্চনা করে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। দক্ষপুরীর মাহাত্ম্যে যে কোন খল ধর্মাত্মা হয়। তাই থেকে এই স্থানের নাম হয়েছিল কন্‌খল্‌। দক্ষপুরীর সমস্ত ইতিবৃত্তকে ছাপিয়ে এই সামান্য ঘটনা কি করে যে প্রাধান্য লাভ করলো, যারজন্য এই স্থানের নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেল। এ কাহিনী আশ্চর্য হয়ে শুনতে হয় এখানে এসে।

দক্ষঘাট

কন্‌খলে গঙ্গার ধারেই বিখ্যাত দক্ষঘাট। ঘাটের ধারেই আলাদা শিব ও সতীর মন্দির। দক্ষঘাটের পরেই ছোট আরেকটি স্নানের ঘাট রয়েছে। যাকে স্থানীয় পাণ্ডারা বলে সতীঘাট। এই ঘাটে নাকি স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় আরোহণ করে সহমরণে সতী হয়েছেন অনেক রমণী। পতিব্রতা রমণীদের কাছে এটি একটি প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থের কাহিনী ও ইতিবৃত্তের মধ্যে একই সুর। সে হচ্ছে পাতিব্রত্য ধর্ম। এই ধর্ম রক্ষার্থেই সতী দেহত্যাগ করেছিলেন এইস্থানে।

হৃষিকেশ

হরিদ্বারের ১৫ মাইল উত্তরে হিমালয়, মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে হৃষিকেশ। বহু প্রাচীন তপোভূমি। এর তিনদিকেই পাহাড়। কাছেই গঙ্গার উপর লছমণঝোলা। এখানে লক্ষ্মণজীর মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে, লছমনজী এই পাহাড়ে তপস্যা করেছিলেন। লছমনজীর নাম থেকে গঙ্গা পারাপারে এই লোহার ঝোলা পুলের নাম হয় "লছমনঝোলা"। রৈভ্য ঋষির তপস্যার গুণে নারায়ণ লক্ষ্মীসহ হৃষিকেশে নিত্য বিরাজমান। এই মহাতীর্থে যাঁরা স্নান-দান ও যপ-তপাদি করেন তাঁদের পরম ধন লাভ হয়।

বদ্রীনাথ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী। তিনি তিব্বত ও হিমালয় ভ্রমণকালে বদ্রী-নারায়ণ দর্শন করতে আসেন। ভগবানের দর্শন লাভে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করে এই স্থানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলেন— "এমন স্থানও ধরণীর মধ্যে আছে! আহা, ভগবান নিজেই এই স্থান বাছিয়া লইয়া জগতের কল্যাণের জন্য এইখানে তপস্যা করিয়াছেন। ইহার ধূলিকণা, প্রতিটি শিলাখণ্ড, প্রতিটি তৃণলতাগুল্ম পরম পবিত্র, চিন্ময়, মধুময়।

হিমালয়ের পাহাড়ের উপর দশহাজার ফিটেরও বেশী উঁচুতে এই বদ্রীনাথের মন্দির। পাথরের প্রবেশদ্বার, নাট্যমন্দির ও গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে রাওয়াল সাহেব ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষেধ। রাওয়াল সাহেবই পূজো অর্চনা করেন। বদ্রী ও

কেদারের পূজারীকে রাওয়াল সাহেব বলা হয়। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী। দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী।

গর্ভগৃহে বেদীর মধ্যস্থলে চতুর্ভুজ বদ্রীনাথের বিগ্রহই প্রধান। বামে লক্ষ্মীনারায়ণ ও নর। দক্ষিণে কুবের ও গণেশ, নীচে গরুড়, উদ্ধব ও নারদ। বদ্রীনাথের বিগ্রহ পাথরের, তিনফুট উঁচু। নানা রঙের কাপড়, ফুল ও অলংকারে সুসজ্জিত। মাথায় মূল্যবান মুকুট ও ছত্র। ধ্যানমূর্তি। পদ্মাসনে পদ্মের উপর উপবিষ্ট। মন্দিরের কাছেই তপ্তকুণ্ড। তপ্তকুণ্ডের পাশেই ঋষিগঙ্গার ধারে একটা ছোট গুহা আছে। এই গুহাতে আচার্য শঙ্কর তপস্যা করেছিলেন। নিকটেই নারদকুণ্ড। নারদকুণ্ডে শঙ্করাচার্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বদ্রীনাথের মূর্তি প্রাপ্ত হন। বদরী বৃক্ষের নীচে নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বৃক্ষের নাম থেকেই ভগবানের নাম হয় "বদরী" বা "বদ্রীনারায়ণ।"

সিন্ধুনদী

হিন্দুনামের উৎপত্তি যেখান থেকে, যেখান থেকে হলো হিন্দু সভ্যতার অভ্যুদয় ও ক্রমবিস্তার—অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে সে নদী আজ পশ্চিম পাকিস্তানে অন্তর্ভূত।

কিন্তু,

আবৃত্তি– যতদিন পর্যন্ত একটি হিন্দু বেঁচে থাকবে হিন্দুস্থানে সেকি ভুলতে পারবে সিন্ধুকে?

অসম্ভব......

কেন না,

এই সেই সিন্ধুনদী
যার তটে উপবেশন করে
আমাদের দেশের মুনিঋষিরা
উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন বৈদিকমন্ত্র
কত সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তাঁরা
অগণিত অমর সংগীত রচনা করে
আনন্দে ভরে তুলেছেন ধরণীকে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা

পাঁচ হাজার বছরের পূর্বেকার সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন এই মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা। মৃত্তিকাগর্ভে প্রথিত এ দুটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে ইংরেজরা এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল করানোর চেষ্টা করেছিল যে, আমরা আর্যরা ভারতবর্ষের যেন কেহই না। অন্যান্যদের মত আমরাও যেন সব বহিরাগত। ১৯১৭ খৃঃ এ দুটি নগরীর ধ্বংসস্তূপ খননের পর থেকেই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁদের এ পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করতে শুরু করেছেন। এখন এই মত দৃঢ় হতে চলেছে যে, আমরা হিন্দুরা আগন্তুক "এরিয়ানদের" বংশধর নই। আমরা সিন্ধু সভ্যতার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা, ভারতবর্ষীয় আর্যদেরই বংশধর। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "আমরা ভারতবর্ষের আগাছা, পরগাছা নই। বহু শতাব্দীর মধ্যদিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে"। তখন এই সত্যই আমাদের কাছে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

লাহোর

লবের নাম হতেই এই নগরের নাম হয় লাহোর। লহোর বহু প্রাচীন শহর। শ্রীরামচন্দ্র এই নগর প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পুত্র লবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। অদ্যাবধি লাহোরে হিন্দু রাজবংশের স্মৃতি বিদ্যমান। রণ্‌জিত সিং-এর রাজধানী, হকিকত রায়ের সমাধিভূমি এবং শিখগুরু অর্জুনদেবের বলিদান স্থান এই লাহোর। সেই পবিত্রভূমি লাহোর আজ পাকিস্তানের কুক্ষীগত হলেও তাকে আমরা ভুলতে পারিনি, পারবো না।

সরহিন্দ

এই স্থানে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছিল গুরু গোবিন্দের দুই ধর্মপ্রাণ শিশুপুত্র ফতে সিং ও জোরাবর সিংকে। সুলতানের ভীতি প্রদর্শনে অবিচলিত দুইটি শিশু। প্রশ্ন করেন সুলতান, "মৃত্যু অথবা ধর্মত্যাগ কোনটি চাও তোমরা?" নির্ভীক উত্তর—

বেরিয়ে আসে শিশুকণ্ঠ থেকে, "ধর্ম ত্যাগ অপেক্ষা মৃত্যুই আমাদের কাম্য"। এর পরের ইতিবৃত্তের কথা আজ আর

কারুরই কাছে অজানা নেই। বর্তমান পাতিয়ালার সেই সরহিন্দ আজও পথযাত্রীদের বেদনাতুর করে তুলে।

অমৃতসর

গুরু অঙ্গদেবের স্থাপিত এই শহরেই বিরাজমান শিখদের পবিত্র স্বর্ণ মন্দির। মহারাজা রঞ্জিত সিংএর দুর্গ গোবিন্দগড়ও এখানে অবস্থিত।

জানিয়ানওয়ালাবাগ

অমৃতসরের আরেকটি স্মরণীয় স্থান জালিয়ানওয়ালাবাগ। ভারতবাসীর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে কঠোরহস্তে দমন করার জন্য পাশ হয় "রাওলাট এ্যাক্ট"। বৃটিশের এই স্বেচ্ছারিতার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে প্রকাশ পায় তীব্র অসন্তোষ। জাতীয় সংগ্রামের এই সংকট মুহূর্তে দেশবাসীর পুরোভাগে এসে দাঁড়ান মহাত্মা গান্ধী। এই আইনের বিরুদ্ধে হরতাল পালনের আহ্বান জানান তিনি। এর সাতদিন পরেই জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঞ্জাবের মেজাজী লাটসাহেব মাইকেন ওজয়ার নিরস্ত্র নিরীহ জনতার উপর নৃশংসভাবে গুলিবর্ষণ করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারা ভারতে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে। সর্বকালের সর্বদেশের স্বাধীনতা প্রয়াসীদের কাছে, পবিত্রতীর্থ এই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ।

জলন্ধর

সাগর পুত্র জলন্ধরের রাজ্য জালন্ধর নামে খ্যাত। এই

জালন্ধরকে জলন্ধর বলা হয়ে থাকে। জলন্ধর হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কথিতে আছে, এই বনে সতীদেবীর বাম স্তন পতিত হয়েছিল। বিশ্বমুখী দেবীর মন্দির তাই একান্ন পীঠের অন্যতম। এই মন্দিরে ধাতুনির্মিত দেবী মূর্ত্তির দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত—কেবল মুখাবয়বে কোন বস্ত্র নেই।

জলন্ধরের কুবের মঠে মহারাজা কণিষ্ক চতুর্থ বৌদ্ধ মহা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনেই বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলি সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ হয়। ফলে পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসাং ৬৩৪ খৃঃ ভারতদর্শন মানসে কাশ্মীর হয়ে এখানে আসেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! সেদিন জলন্ধর মহাচীনের মহামানবকে যে পরমসমাদরে বরণ করে ছিল, আজ সেই জলন্ধর সাম্রাজ্যবাদী বর্বর চীনাদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার এক প্রধান কেন্দ্রে পরিণত। জলন্ধর এখন কেবলমাত্র পবিত্র তীর্থক্ষেত্রই নয়, ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সেনানিবাসও বটে।

কাশ্মীর

ভারতমাতার রত্নমুকুট পৃথিবীর নন্দনবন এই ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ। সেই কাশ্মীরের অর্ধাংশ আজ শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তানের কুক্ষীগত। এই অন্যায় এই ষড়যন্ত্রকে কোনদিনও মেনে নিতে পারেন নি আমাদের জনপ্রিয় নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ।

তাই ১৯৫৩ সালে শুনলাম এই পাকিস্তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। "কাশ্মীর আমাদের" এই সত্যের

প্রতিষ্ঠাতে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুবরণ। মরেও যিনি ন্যায়কে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁর হাতের পতাকা নামায় না, তিনিই নির্ভীক সৈনিক। কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু, দুর্জয় সৈনিকেরই মৃত্যু। মরেও তিনি অমর হয়ে রইলেন ভারতবাসীর অন্তরে। তাই শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ নিয়ে যখন বিমান পেঁছুলো সুদূর দমদমের রানওয়েতে তখন প্রতীক্ষমান জনসমুদ্র লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলে শ্রদ্ধা জানালো সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিককে "শ্যামা-প্রসাদ অমর হউক। শ্যামা প্রসাদ দীর্ঘজীবী হউন।"

অমরনাথ

"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমস্তুতে ॥"

আজও দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ম্ভূরূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন অনাদিকাল হতে। ত্রিনয়নের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি অবলোকন করেন ত্রিকাল আর প্রহরা দেন ত্রিলোক।
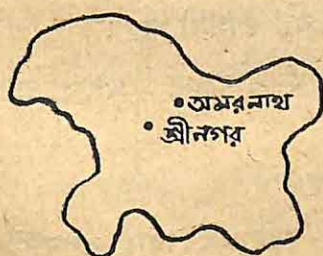
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে সত্য হয়ে ওঠে তুষারাবৃত শিবলিঙ্গের মধ্য দিয়ে। সত্য, শিব আর সুন্দর—কবির কল্পনা নয়। প্রত্যক্ষ বাস্তব।

শ্রীনগর

একদা গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল এই শৈলপুরী শ্রীনগর। এ নামের এক ইতিবৃত্ত আছে। এখানে শ্রীদেবীর মন্দির ছিল খুব প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির। দেবী ছিলেন জাগ্রতা। মন্দিরে তাঁর আসন ছিল, যন্ত্র ছিল প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কার সাধ্য সে-যন্ত্রের সামনে গিয়ে সাহস করে দেবীর পুজো দেয়! দেবী এখানে সংহারকারিণী মূর্তি নিয়ে বিরাজমানা!

ভগবান শঙ্করাচার্য এলেন এই পথে. তিনি শুনলেন দেবীর এই সংহারকারিণীর মূর্তির কথা। মনে মনে ভাবলেন— একি বিচিত্রই শুভদা-বরদা মায়ের আবার সংহারকারিণী রূপ থাকবে কেন। ভগবান শঙ্করাচার্য আরাধনা শুরু করলেন শ্রীদেবীর। কঠোর তপস্যা আর কৃচ্ছ্রসাধনা করলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী দর্শন দিলেন বরদায়িনী মূর্তি নিয়ে।

দেবী বললেন, 'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট। তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।'

ভগবান শঙ্করাচার্য বললেন, 'মাতঃ, আমার একটিমাত্র প্রার্থনা।'

'—বল পূরণ হবে।'

'—মাতঃ, আমি যেমন তোমার বরদায়িনী মূর্তি দর্শন করবার সৌভাগ্যলাভ করেছি ; প্রার্থনা করি, সমস্ত ভক্তও যেন তোমার এই বরদায়িনী মূর্তির সামনে এসে তোমার পুজো, আরাধনা করতে পারে।

দেবী বললেন—সে অসম্ভব। আমি এখানে মায়াবদ্ধ জীবের জীবত্ব সংহারের জন্য অধিষ্ঠিত আমিত্ব বিনাশের জন্য জাগ্রতা। তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

ভগবান শঙ্করাচার্য বললেন—আমার অন্য কোন বরের প্রয়োজন নহে।

দেবী অবশেষে বললেন—বেশ, তোমার প্রার্থনাই পূরণ হবে। তবে আমার যন্ত্রের সম্মুখীন হতে পারবে না কেহই। তাই আজ থেকে আমার যন্ত্র বিপরীত দিকে আসীন হবে। সমস্ত ভক্ত পূজো দিতে পারবে।

সেই থেকে শ্রীদেবীর যন্ত্র বিপরীত দিকে আসীন হল। ভক্তবৃন্দ পূজো দিতে শুরু করলো যথারীতি। এই জাগ্রত দেবীর নাম অনুসারেই এইস্থানের নাম হল শ্রীনগর।

পৌরাণিক যুগে শ্রীনগরের কি পরিচয় ছিল জানা যায় না। তবে এই পথ মহাপ্রস্থানের পথ। এই পথের আশেপাশের মন্দিরগুলির সেই অতীত কাহিনীর পরিচয় বহন করে রয়েছে।

শ্রীনগরের মাইল কয়েক আগেই ভীল্লকেশ্বরের শিব মন্দির। মন্দিরের বাহিরে ছোট ছোট মূর্তি। কাছেই একটি পাথরের উপরে মস্তবড় পদচিহ্ন আছে। সে পদচিহ্ন অর্জুনের পদচিহ্ন নামে পরিচিত। এখানে অর্জুন এসেছিলেন তপস্যা করতে। এই তপস্যাক্ষেত্রে কিরাতরূপী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের

মল্লযুদ্ধ হয়। অবশেষে তুষ্ট মহাদেব অর্জুনকে পশুপাত অস্ত্র দান করেন।

শ্রীনগরে আছে বিখ্যাত কমলেশ্বরের মন্দির। শহর থেকে মাইলখানেক দূরেই খুব প্রাচীন মন্দির। এখানকার শিবের নাম কমলেশ্বর হয়েছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্য। বনবাসে থাকবার কালে ভগবান রামচন্দ্র এখানে কিছুকাল কাটিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি শিবের আরাধনায় রত হন। শিব-পূজার জন্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সহস্র পদ্মফুল। এই সহস্র পদ্মফুল থেকেই একটি লুকিয়ে রাখলেন অগ্নিদেব রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করবার জন্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পূজো করছেন তন্ময় হয়ে। তিনি সহস্রাক্ষের এই ছলনা জানতে পারলেন না। তিনি সবগুলি পদ্ম শিবের চরণে উৎসর্গ করবার পর দেখলেন সহস্র পদ্মের মধ্যে সংখ্যায় একটি কম। কোথায় গেল একটি পদ্ম? মাত্র একটি পদ্মের জন্য শিবপূজো অসমাপ্ত থাকবে? তাঁর এত আয়োজন এত নিষ্ঠার ফল ব্যর্থ হবে? হঠাৎ তার মনে হল, সবাইতো তাকে কমললোচন বলে। তার চোখ কি তবে পদ্মফুলের মত? তাই যদি হয় তবে একটি পদ্মের অভাব তিনি নিজের চোখদিয়ে পূর্ণ করবেন। যেই ভাবা, অমনি একটি চোখ উপড়ে ফেলতে উদ্যত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিদেব দর্শন দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন অপহৃত পদ্মফুলটি। সেই পদ্মফুল দিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শিবের পূজো সম্পন্ন করলেন। সেই থেকে ওখানকার শিবের নাম হয় কমলেশ্বর।

জম্মু

হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান এই জম্মু। এখানে আছে প্রসিদ্ধ রঘুনাথের মন্দির।

কুরুক্ষেত্র

সৃষ্টির আদিকাল থেকে দৈবশক্তির সঙ্গে আসুরিক যে সংগ্রাম, যে সংগ্রামে বার বার মনে হয়েছে মানবসভ্যতা বুঝি বিপন্ন, সৎ এবং সাধুব্যক্তিদের বুঝি ত্রাণ নেই দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে! মহাভারতের যুগে এসেছিল তেমনি এক ভয়ঙ্কর দিন। আলো-অন্ধকারের লুকোচুরির খেলাই তখন আধারের জয় যাত্রা, দাম্ভিকতা ও স্বাত্বিকতার দ্বন্দ্বে তখন দম্ভের জয়োল্লাস। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে সেই দলিত মদমত্ততার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হলো গীতার অমর বাণী—

"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি
র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান ধর্মস্য তদাত্মানম্,
সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনর্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জড়বাদি ভোগসর্বস্ব আত্তরিক অসভ্যতার ঘটলো চির-সমাধি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরাঙ্গণে। সেই সঙ্গে সূচিত হলো শাশ্বত অধ্যাত্মবাদী সনাতন দৈবী হিন্দুসভ্যতার বিজয় অভিযান। গীতারূপে সে অমৃত বাণী ছড়িয়ে গেল ভূলোক থেকে দুলোকে-ত্রিলোকে।

দিল্লী

বর্তমান ভারতের রাজধানী। নব নব পর্যায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য যেখানে বার বার নির্ধারিত হয়েছে। কৌরবকুলের ব্যর্থ চক্রান্তের ইতিহাস, মোগল সাম্রাজ্যের নির্মম ইতিকথা আর ক্রূড় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের কুশাসনের নির্দয় কাহিনীর নিরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই দিল্লী। যমুনার জলধারায় নিঃশব্দে বয়ে গিয়েছে কতশত যুগের কত কীর্তি-কাহিনীর করুণ বিলাপ।

কাশী

মনোনিবৃত্তি পরমোপশান্তিঃ সাতীর্থবর্যামণিকার্নিকাচ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবিমুক্তক্ষেত্র তীর্থরাজ কাশী অবস্থিত। এখানে পতিতপাবনি গঙ্গা উত্তর-বাহিনী। এই তীর্থের উত্তর-পশ্চিমে বরুণা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অসি নামে দুটি নদী। এই নদী দুটির নাম থেকেই কাশীর অপর নাম হয়েছে বারাণসী। কাশীকে বিশ্বনাথের রাজ্য বা শিবপুরী বলা হয়।

কাশী কেবল ধর্মীয় মাহাত্ম্যের জন্য নয়, কাশী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন নগরী। বৈদিক যুগ থেকেই কাশীর উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে, ভারতের উপর দিয়ে কত ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে, বিদেশী ও বিধর্মীর আক্রমণে কাশী কতবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু বাইরের সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের মধ্যেও কাশী প্রসন্ন কল্যাণময়ী

আসনে যোগীর মত আজও সমাসীন। সে যেন জাগতিক "লাভ-ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ" প্রভৃতির অতীত লোকে বিচরণ করছে। কাশী ভারতের সংস্কৃতচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তারই ঐতিহ্যবাহী। সংহারকর্তা রুদ্র এখানে বৈরাগ্য ও বিনয়ের প্রতিচ্ছবি। অন্নপূর্ণার দ্বারে ঈশ্বরের ভিক্ষুকের দীনতা।

শাস্ত্রে আছে কাশীতে মরলেই মুক্তি। তাই এখানে অনেকেই তীর্থ বাস করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান। এখানে মণিকর্ণিকার ঘাট ও হরিশ্চন্দ্রের ঘাট নামে দুটি মহাশ্মশান। মণিকর্ণিকাতে অহর্নিশি শবদাহ হচ্ছে। আর হরিশ্চন্দ্র ঘাট শ্মশানে চণ্ডালের কাছে রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করে বিশ্বামিত্র মুনির ঋণ শোধ করেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার নাম অনুসারেই এই ঘাটের নাম হয় হরিশ্চন্দ্র ঘাট।

সারনাথ

কাশীর পাঁচমাইল দূরেই সারনাথ। ঋষিপত্তন এর প্রাচীন নাম। গয়ায় সিদ্ধিলাভের পর বুদ্ধ গিয়েছিলেন এই সারনাথে তাঁর পাঁচজন সঙ্গীদের খোঁজে। সারনাথের মৃগদ্বার উপবনে বসে আমাদের তিনি নূতন ধর্মের কথা শুনিয়েছিলেন। এরই নাম ধর্মচক্র প্রবর্তন। সঙ্গীরা শিষ্য হলেন। ষাটজন ভীক্ষুকে নিয়ে বুদ্ধ সংঘ গঠন করলেন। দিকে দিকে এই শিষ্যরাই ছড়িয়ে পড়লেন বুদ্ধের নূতন ধর্মপ্রচারে। সারনাথে তৈরী হল সদ্ধর্মচক্র প্রবর্তন বিহার। আজ যে বৌদ্ধ-

ধর্ম বিশ্বের অসংখ্য মানুষের প্রাণের ধর্ম, সেই ধর্মের প্রথম রূপ নিয়েছিল এই সারনাথে।

অযোধ্যা

কোশল রাজের রাজধানী অযোধ্যা। শত্রুর অজেয় বলে এর নাম অযোধ্যা। রঘুকুলের নামের সঙ্গে যে রাজ্যের নাম আজও উচ্চারিত হয় প্রতিটি হিন্দুর কণ্ঠ থেকে, সেই হল অযোধ্যা। সেই রঘুবংশেরই শ্রেষ্ঠ রাজা প্রভু রামচন্দ্রের জন্মস্থান, তাঁর শৈশবের লীলাভূমি এই অযোধ্যা।

মথুরা-বৃন্দাবন

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই মথুরা-বৃন্দাবন। মথুরা মুক্তিক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথ, রাধাবল্লভ, মদনমোহন, বাঁকাবিহারী, কালিয়াদমন, গোপেশ্বর শিব ও কালীর মন্দির আছে। গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির লাল পাথরের। এটা এক বিরাট মন্দির। মন্দিরের চূড়োতে আলো জ্বলতো! আওরঙ্গজেব আগ্রা থেকে ঐ আলো দেখতে পেয়ে ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করেন। আজও বিগ্রহবিহীন বিরাট মন্দিরের শীর্ষদেশের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এই ভগ্নমন্দিরের নিকটেই গোবিন্দজীর পূজা অর্চনা চলে। আওরঙ্গজেবের অত্যাচারের সময়ে পূজারিগণ গোবিন্দজীকে জয়পুরে স্থানান্তরিত করেন। অদ্যাবধিও জয়পুরের রাজা গোবিন্দজীর পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে চলেছেন। পূজারী বঙ্গভাষী। বৃন্দাবন-মথুরার চার-পাঁচ মাইল দূরে যমুনাতীরে

অবস্থিত। বৃন্দাবনের প্রায় তিনদিকে যমুনা প্রবাহিতা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপ বালক-বালিকাদের সঙ্গে এখানে লীলা করেছিলেন। এই কারণে এটি একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এর প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। সেইজন্য বৃন্দাবনের রজও পবিত্র।

মথুরার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে গোকুল। যমুনার তীরে অবস্থিত নন্দের বাসস্থান। কৃষ্ণ-বলরামের বাল্য-লীলাক্ষেত্র।

প্রয়াগ

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রয়াগ প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। বারো বছর অন্তর এখানে অনুষ্ঠিত হয় কুম্ভমেলা। এই মেলায় যোগদান করে প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে স্নান করে ভারতের সর্বশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দু অর্জন করে অক্ষয় পূণ্য। রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ে এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত ধর্ম-মহাসম্মেলন। বহু-শতাব্দী পরে আবার এখানেই অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব হিন্দুধর্ম সম্মেলন, যার উদ্যোক্তা ছিলেন বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ।

জনকপুর

লুপ্ত নগরী মিথিলার অন্য নাম হল জনকপুর। মহারাজ জনক হলেন যার প্রতিষ্ঠাতা। এখানেই হরধনু ভঙ্গ করে সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। প্রাচীন ভারতে অযোধ্যা যেমন রাজকীয় আড়ম্বর এবং ঐশ্বর্যের মহিমায় মহিমান্বিত, তেমনি মিথিলার প্রসিদ্ধি— জ্ঞান ও বিদ্যার

জন্য। মিথিলার রাজর্ষি জনক, কপিল, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক, গার্গী ও মৈত্রেয়ী সকলেই ভারতের গুরুস্থানীয়। ভারত ইতিহাসে মিথিলার নাম বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মিথিলার আরও একটি গৌরবময় যুগ আসে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। মিথিলার রাজধানী তখন গজরথপুর। মিথিলার সিংহাসনে তখন রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ। শিবসিংহের সভাপতি বিদ্যাপতি ঠাকুর। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বাংলার কবি চণ্ডীদাস ছিলেন সমসাময়িক। ইতিহাস বলে, মিথিলাপতি শিবসিংহ এবং গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে পরস্পর চুক্তি-বদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

পানিপথ

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদেশীদের সঙ্গে ভীষণতম সংগ্রামে দেশবাসীকে লিপ্ত হতে হয়েছে বহুবার। ভারতের সেই সংগ্রামী ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে পানিপথের রণাঙ্গণ।

পাটলিপুত্র

বিহার রাজ্যের গঙ্গা এবং শোনভদ্র নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল এই প্রাচীন নগর পাটলিপুত্র। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতাব্দীতে এই নগরের নির্মাণ করেছিলেন অজাতশত্রু নামে এক নৃপতি। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি মহান সম্রাটেরা এবং আর্যভাট্টর মত প্রখ্যাত পণ্ডিত এই নগরে বসবাস করে এর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। আবার এই পাটলিপুত্রেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন

শিখদের অন্যতম গুরু গুরুগোবিন্দ সিং। এই পাটলিপুত্রই বর্তমানে পাটনা নাম গ্রহণ করে বিহার প্রদেশের রাজধানী রূপে বিরাজমান।

গয়া

বিহার রাজ্যের ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের পঞ্চ-তীর্থের অন্যতম হিন্দু-তীর্থস্থান এই গয়া নগরী। গয়া নামে এক রাজর্ষী এই নগরের নির্মাতা। অত্যন্ত প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র এই গয়া। হিন্দুদের বিশ্বাস এই পুণ্যক্ষেত্রে যার শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই অক্ষয়ব্রহ্ম লাভ করে। ভগবান রামচন্দ্র এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এখানেই সম্পন্ন করেছিলেন তাঁদের পিতৃশ্রাদ্ধ। বিষ্ণুপাদ মন্দির গয়ার শ্রেষ্ঠ মন্দির।
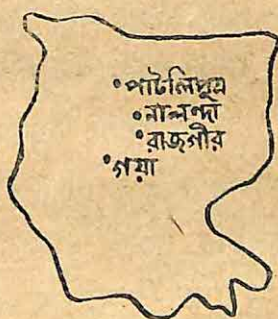
গয়াসুর ছিল বিষ্ণুর পরম ভক্ত। সে বিষ্ণুকে লাভ করার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে। বিষ্ণু তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, গয়াসুরের দেহ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও যোগীদের চেয়ে শুদ্ধ, সত্ত্ব ও পবিত্রতম হবে। ফলে এই শুদ্ধদেহ দর্শন মাত্রেই সকলের মুক্তি ঘটতে লাগলো। যম মহাবিপদ

দেখলেন। তিনি বিষ্ণুকে গিয়ে বললেন, আর কেহই তাঁর শাসনে আসছে না। দেবতাগণও এই ব্যাপারে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা সবাই মিলে গয়াসুরকে বললেন—'তোমার দেহ আমাদের দান কর।" গয়াসুর রাজী না হওয়ায় তাঁরা প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর তার বুকের উপর চাপা দিলেন। এতেও গয়াসুর স্থির হ'লো না। তখন স্বয়ং বিষ্ণু বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ করে ঐ পাথরের উপর তাঁর চরণকে স্থাপন করলেন। ভগবানের এই তপস্যার স্থান পরে 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রখ্যাত। যে বৃক্ষের নীচে বসে গৌতম তপস্যা করেছিলেন তার নাম 'বোধিদ্রুম'। পরবর্তীকালে প্রিয়দর্শী অশোক এই বৃক্ষের সন্নিকটে এক বিরাট প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করেন।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

সংঘং শরণং গচ্ছামি।

আজও সেখানকার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি মন্দিরে সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসারতাপিত ছেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড় হাতে বলছে ঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তার জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে। তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে।

নালন্দা

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ বিদেশের

প্রায় দশসহস্র বিদ্যার্থী এখানকার আবাসিক ছাত্রাবাসের সেবা করে সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করতো ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সুমান শিক্ষা। শীলভদ্র ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রধান অধ্যক্ষ।

রাজগীর

মহাভারতের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান রাজগীর। এই রাজগৃহ ছিল মহারাজ জরাসন্ধের রাজধানী। প্রবল পরাক্রম রাজা জরাসন্ধকে মধ্যম পাণ্ডব ভীম শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে এইখানেই বধ করেছিলেন দ্বৈত সংগ্রামে। শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি স্পর্শে ধন্য হবে গিরিব্রজ বা রাজগৃহ! পরবর্তীকালে গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর বহুবার এখানে সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। মগধের রাজা বিম্বিসারের প্রধান নগরী এই রাজগৃহ। সম্রাট অশোকও জীবনের শেষকাল কাটিয়েছেন এইখানে। আজ বৌদ্ধজৈন সকলেরই তীর্থস্থান এই রাজগীর।

বৈদ্যনাথধাম

শ্রাবণী পূর্ণিমা আর শ্রীপঞ্চমীতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী-বৈদ্যনাথের দর্শনলাভের জন্য বৈদ্যনাথধামে এসে থাকেন। পাশেই শ্রীপাদস্পর্শে গয়াসুরের দিব্যজ্ঞান হলো। সে দেবালয় স্তুতি করতে লাগলো। তার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। গয়াসুর ক্ষণভঙ্গুর এই শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করে মানবের হিতকামনায় অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের জন্য এই বর প্রার্থনা করলো যে "হে প্রভু, যদি সত্যই আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে এই বর প্রদান

করুন যে, আমার নাম অনুসারেই এইস্থান গয়াক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য বা পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে সে পর্যন্ত যেন দেবতাগণ আমার বুকের উপর বিদ্যামান থাকে এবং এ যেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়। ভগবান যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি গয়াসুরের প্রার্থনা পূরণ করলেন। গয়া মুক্তিক্ষেত্রে পরিণত হল দেবী জয়দুর্গার মন্দির। একান্ন-পীঠের একপীঠ হলো এই দেবী জয়দুর্গা আর ভৈরবের নাম বৈদ্যনাথ। শিবের নামেই এই স্থানের নাম হয়েছে বৈদ্যনাথধাম।

বুদ্ধগয়া

গয়ার অনতিদূরেই বুদ্ধগয়া। এই পবিত্রস্থানে গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তহন। বৌদ্ধগণের একটি পবিত্র তীর্থস্থান এই বুদ্ধগয়া। গৌতম সত্যলাভের উদ্দেশ্যে নানাদেশ ভ্রমণ করার পর বুদ্ধগয়ার অনতিদুরে এক গ্রামে শাস্ত্র অধ্যয়নেও শান্তিলাভ করতে পারলেন না। তখন তিনি গয়ার কাছে নৈরঞ্জন নদীর তীরে উরুবিল্ব স্থানে এক বৃক্ষের নীচে কঠোর তপস্যায় নিরত থেকে সিদ্ধিলাভ করেন এবং বুদ্ধনামে পরিচিত হন।

ইহাসনে শুষ্যতু সে শরীরন।
বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুইভাং।
নৈবাসনাৎ কায়সত্তশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হউক। ত্বক অস্থি মাংস প্রলয়প্রাপ্ত হউক। বহুকল্পেও দুর্লভবোধি প্রাপ্ত না হইয়া এই আসন হইতে শরীর বিচলিত হইবে না।

মামুদপুর (রাজা সীতারামের রাজধানী)

যেসব জায়গায় যুগাবতার মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ অথবা ধর্মপ্রচার করেছিলেন, যেসব জায়গায় পুরানোক্ত দেবতারা লীলা করেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ এমন সব জায়গাকেই সকলে তীর্থ বলেন। কিন্তু আমাদের মতে তীর্থ আরও বিস্তীর্ণ। যেখানে যুগাবতার মণীষীরা—ইতিহাস বর্ণিত স্বদেশ প্রেমিকেরা নিজেদের শৌর্য ও কর্মশক্তির দ্বারা দেশগৌরব রক্ষা করেছেন, সেগুলিও তীর্থ এবং আমাদের মতে মহাতীর্থ।

বাঙ্গালার এইরকম একটা মহাতীর্থ হলো সীতারামের রাজধানী মামুদপুর। প্রতাপাদিত্যের একশ বছর পরে যশোহরের রাজা সীতারামের অভুদ্যয় হয়। আওরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট এবং শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার সুবেদার। অত্যাচারীর হাত থেকে সীতারাম দেশকে রক্ষা করার জন্য সারাটা জীবন চেষ্টা করেছেন এবং পরিশেষে বীরের মত প্রাণ দিয়েছেন, তবু বশ্যতা স্বীকার করেন নি।

সীতারামের মা দয়াময়ী ছিলেন তেজস্বিনী নারী। একবার তিনি নিজে অসি নিয়ে এঞ্জেল ডাকাতকে শায়েস্তা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মায়েরই ছেলে সীতারাম। ভয়কে জীবনে তিনি কোনদিনই ভয় করতেন না।

এই সীতারামের রাজধানী মামুদপুর স্থানটি ছিল অত্যন্ত রক্ষিত। এর পূর্বে মধুমতী নদী, পশ্চিমে নবগঙ্গা আর দক্ষিণে

বিরাট ফুরসীব বিল। গোপালপুর, হরেকৃষ্ণপুর, শ্যামনগর রাধানগর, গোকুলনগর, পুরোনো বাজার, ধূপড়িয়া গ্রামের সমষ্টিকেই বলা হত মামুদপুর। মুসলমান নবাবের চোখে ধূলি দিবার জন্যই দেবদেবীর নামানুসারে এতগুলি গ্রামের নাম সীতারাম মহম্মদপুর বা মামুদপুর রেখেছিলেন। সীতারাম রাজধানীর মধ্যে অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এক একটা গ্রামকে সেইসব বিভিন্ন মন্দিরের বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

সীতারামের রাজ্যশাসনের সুনাম দেশীয় অন্যান্য রাজারা সহ্য করতে না পেরে নানাভাবে তারা নবাবের কাছে সীতারামের বিরুদ্ধে নানাকথা প্রচার করতে লাগল। রাজা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি রাজপুরীকে আরও সুরক্ষিত করেন। এমন কি কামান পর্য্যন্ত তৈরী করলেন। কানু খাঁ ও ঝুমরু নামে তাঁর দুটি কামান ছিল।

একটা আকস্মিক লড়াইয়ে সেনাপতি মৃন্ময় তাদের ফৌজদার আরতোরসের প্রাণ সংহার করলেন। সীতারাম দেখলেন এইবার প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ বাঁধবে এবং সত্যই নবাবের সঙ্গে সীতারামের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বেঁধে গেল। নবাবকে বিপর্যস্ত করে তুললো সেনাপতি মৃণ্ময়। তারপর নবাব বক্স আলি খাঁকে পাঠালেন, আর তার সঙ্গে বুদ্ধি করে দুজন হিন্দুকেও দিলেন।

ছদ্মবেশে এবং কৌশলে মৃণ্ময়ের গুপ্ত হত্যা সাধিত হল। সীতারাম যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিলেন। স্বাধীনতাই

ছিল বীর সীতারামের জীবনের মূলমন্ত্র। সেই প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধস্থান এই মামুদপুর। আজও মধুমতী নদীর ভাঙ্গন কূলের পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে মামুদপুরের সেই গৌরবপূর্ণ ইতিহাস। রাজধানীর আসে-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে রামসাগর নামে একটি বৃহৎ জলাশয়, রাজবাড়ী, সিংহদ্বার, মহাপূজার মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টভূজ দ্বিতল মন্দির আর জোড় বাঙ্গালার ধ্বংসাবশেষ।

কালীঘাট

কালীঘাট বাংলার শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র মহাপীঠস্থান কালীঘাটের দেবীর নাম কালিকাভৈরব নকুলেশ্বর। কালীমন্দিরের খুব নিকটেই নকুলেশ্বর শিবের মন্দির। প্রান্তভাগে আদি গঙ্গা দেবীমুর্ত্তির অধোভাগ অদৃশ্য। আদি মন্দির যশোহরের বীর রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় তৈরী করেছিলেন।

কালীঘাটের নিকটেই বিখ্যাত কেওড়াতলার শ্মশান। এই শ্মশানেই আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র যতীন্দ্রনাথ বীরেন্দ্র শাসমল প্রভৃতি দেশপ্রাণ সুসন্তগণের মিলনে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিতা-ভস্মের উপর সম্পূর্ণ প্রাচ্যপ্রথায় একটি সুন্দর স্মৃতিশৌধ তৈরী করা হয়েছে।

পাহাড়পুর

এ স্থানটি বর্তমানে বাংলাদেশে রাজশাহী জেলায় অবস্থিত।

কিছুদিন আগেও সেখানে একটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এতবড় বৌদ্ধবিহার বোধহয় ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না। শতাব্দীর শেষে ধনপাল একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাহাড়পুরের নিকটে সোমপুরে। ধর্মপাল তাঁর চল্লিশ বছরের-কালে ধর্মশিক্ষার জন্য পঞ্চাশটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন বরেন্দ্রভূমিতে। তিনিই স্থাপন করেছিলেন সোমপুরবিহার। বাংলাদেশে তখনও যে প্রথমশ্রেণীর শিল্প ছিল, সোমপুর বিহারের দেওয়ালে অঙ্কিত মূর্তিগুলি না দেখলে তার আর বিশ্বাস করা যায় না। কৃষ্ণের বালীবধ, যমুনা বা সেই বহুবিতর্কীত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ভারতের যে কোন মন্দির-ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনীয়।

নাটোর

নাটোরও রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। রানী ভবানী ছিলেন এই নাটোরের রানী। অহল্যাবাঈ-এর মত তিনিও এখন সারা ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া রানী। ভবানী ছিলেন রাজসাহী জেলারই এক গ্রামের মেয়ে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল নাটোরের জমিদার রামকান্তর সঙ্গে। ৩২ বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন একমাত্র কন্যা তারাকে নিয়ে। দেড় কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক রানী ভবানী বাংলার নবাব সিরাজদৌলার সমসাময়িক ছিলেন। তখন নবাবী আমলের অত্যাচার-উৎপীড়নে বাংলার জনসাধারণের দুর্দশার আর সীমা ছিল না।

তার উপরে সিরাজদ্দৌলার শ্যেনদৃষ্টি ছিল রানী ভবাণীর সুন্দরী কন্যা তারার উপর। কিন্তু নবাব বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। বিধবা কন্যাকে রক্ষার জন্য রানী ভাবানী অসংখ্য বৈষ্ণব এসেছিলেন সান্তারাম বাবাজীর আখড়া থেকে। এর ফলে নবাবের লোকেরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ৭৭-এর মন্বন্তরে দেখেছি রানী ভবানী নিজের রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিলেন দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। ভারতের নানা তীর্থে তাঁর অকৃপণ দানের জন্য আজও তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া। সুদূর বারানসীতেও রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির নিদর্শন।

ভবানীপুর

বাংলাদেশেও রানী ভবানীর কীর্তি রয়েছে ভবানীপুর ও বড়নগরে। একসময়ে করতোয়া যমুনার সঙ্গমস্থল ছিল এই ভবানীপুরে। কথিত আছে এবং ভবানী দেবীর পূজারীরাও বলেন, সতীর বামকর্ণ পড়েছিল এখানে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে আছে ঃ

করতোয়া তটেপড়ে বামকর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অর্পনা তাঁহার॥

করতোয়া তট যে একটি পীঠস্থান তা সর্বজনস্বীকৃত। রানী ভবানীর দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণের তপোবন এবং যজ্ঞকুণ্ড আজও আছে ভবানীপুরে।

বড়নগর

রানী ভবানীর খুব প্রিয় স্থান ছিল এই বড়নগর। তিনি

ভেবেছিলেন, এই বড়নগরকে বাংলার কাশীতে পরিণত করবেন। চেষ্টা করে সফলও হয়েছিলেন অনেক পরিমাণে। ভবানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরী যেন কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা। তাঁর কন্যা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোপাল বিন্দুমাধব ও অষ্টভূজ গণেশ। এই গণেশ যেন কাশীরই শ্রেষ্ঠ রাজ। আরও অসংখ্য নানা দেবতার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এইসব মন্দিরে আজও অনেকে যায় পোড়া-মাটির শিল্পনৈপুণ্য দেখতে। রানী ভবানীর কীর্তি লাঞ্ছিত এই বড়নগর হল মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থেকে কিছুটা দূরে, গঙ্গার ধারে। এই অনাদৃত মন্দিরের গ্রামটি আজ বাংলার গৌরবের বস্তু।

গৌড়

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান এই গৌড়ই ছিল একদা সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী। গৌড়ের গৌরবময় ইতিহাসের সংগে জড়িয়ে আছে বহুযুগের বাঙলাদেশের ইতিহাস। বহু রাজ্যের উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। ঐতিহাসিকেরা বলেন, পালবংশের রাজা প্রথম গোপালদেবের রাজ্যকাল থেকেই গৌড়নগর ইতিহাসের সূত্রপাত। কিন্তু গৌড় রাজ্যের বিস্তৃতি ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ধর্মপাল দেবের সময়ে। পাল রাজবংশের পর আসেন সেন রাজবংশ। এই বংশের শ্রেষ্ঠরাজা লক্ষণসেনের সময় গৌড়ীয়শিল্পের বিশেষ উন্নতি ও প্রসার লাভ ঘটে। ১২০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁরই

সময়ে মুসলমানেরা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে। গৌড়ের বর্তমান মসজিদগুলিতে হিন্দুসংস্কৃতির সস্পৃষ্ট চিহ্ন আজও দেখা যায়। গৌড় বঙ্গাধিপতি লক্ষণসেনই ছিলেন বাঙালো দেশের শেষ হিন্দুরাজা।

নবদ্বীপ

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাভূমি এবং তাঁর জন্মস্থান। পর শাসনের নিপীড়নে স্তব্ধ, ধর্মের অবমাননায় বিভ্রান্ত, বিমূঢ় আর প্রতিকারে অসমর্থ হিন্দুসমাজ যখন নিষ্ক্রিয়তায় অবসন্ন, নৈরাজ্যে জড়প্রায়, সেই নিরানন্দ, নিরুপায়, হিন্দুসমাজকে যিনি সেদিন নবজীবনের উচ্ছাসে স্পন্দিত করে তুলেছিলেন, হিন্দুধর্মকে জনজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যিনি হিন্দুর বিপন্নতাকে জাগিয়ে ছিলেন, তিনিই হলেন বাঙলার হৃদয় মোথিতধন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। বসন্ত পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতেই বাঙলার বৃন্দাবন এই নবদ্বীপধামেই ঘটেছিল তাঁর মহাবির্ভাব !

কামারপুকুর

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূণ্য জন্মলীলা আমাদের এই কামারপুকুর। অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আজ দ্বন্দ্ব কোলাহল মুখর বিংশ শতাব্দীতে সংসার তাপদগ্ধ মানবের কাছে পরম শান্তি আর আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই কামারপুকুর। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে যখন এই পুণ্যভূমি ভারত একেবারে মোহিত, পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সভ্যতা, বেশভূষা যখন নির্বিচারে ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে ; সনাতন

হিন্দুধর্ম যখন বিলুপ্তির পথে যেতে বসেছে—সেই ধর্মসংকটের দিনে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার এই ছোট্ট গ্রাম কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত গদাধর মিশ্র, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বোলপুর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন এই বোলপুরেই অবস্থিত। 'সত্যম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'-এর বাণী এখান থেকেই থেকে উদ্‌গত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের আকাশে-বাতাসে। রবীন্দ্রনাথের তপস্যাধন্য শান্তির পীঠস্থান এই শান্তিনিকেতন আজ পৃথিবীর শ্রদ্ধার বস্তু।

দক্ষিণেশ্বর

উনবিংশ শতাব্দীতে মুখোমুখী হলো দুটি বিরোধী জীবনবোধ ঃ জড় বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ইউরোপ আর অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ। সেই অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের সার্থক প্রতিনিধি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁরই সাধনার পীঠস্থান এই দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির হিন্দুদের কাছে একটি পরম তীর্থস্থান।

বেলুড়

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য বিবেকানন্দের অক্লান্ত প্রয়াসের অবিনশ্বর সাক্ষর বহন করে দণ্ডায়মান এই বেলুড় মঠ

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম পীঠস্থান। যে মঠ আজও বহন করে চলেছে উদাত্তকণ্ঠে সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দের মহিমার কথা।

গৌহাটি

আসাম রাজ্যের রাজধানী গৌহাটি। এখানে আছে উমানন্দ ও অশ্বক্রান্তের মন্দির আর আছে ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রম। গৌহাটি
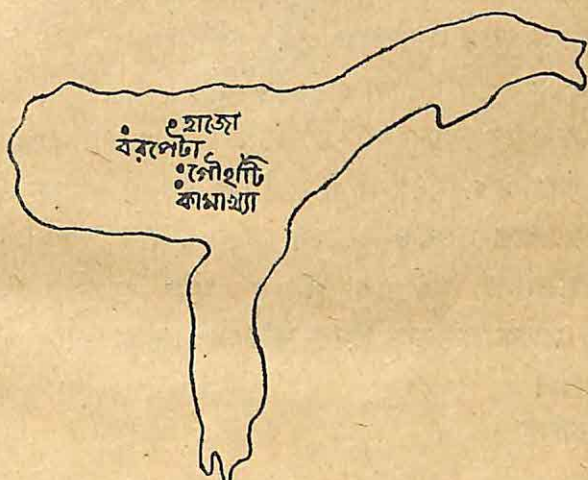
শহরের অনতিদূরেই প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত কামাখ্যাদেবীর পুণ্যমন্দির; সতীর বাহান্নপীঠের অন্যতম।

হাজো

গ্রীব মাধবের বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ এবং শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত কামরূপের হাজো। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মহত্ত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। তাই সুদূর ভূটান তিব্বত সিকিম থেকেও তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন পুণ্য অর্জনের জন্য।

বরপেটা

আসামে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক হলেন আচার্য শংকর দেব। ইনি ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক। বরপেটা তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রধান প্রচারকেন্দ্র। এখানে আছে বৈষ্ণবগণের প্রখ্যাত মন্দির।

লাখিমপুর

এই লাখিমপুরেই অবস্থিত পরশুরাম কুণ্ড। একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করে পরশুরাম দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম করে অবশেষে এসে পেঁছুলেন ভারতের পূর্বপ্রান্তে এই লাখিমপুরে। পরশুরাম মহাপাপের ভাগী হয়েছিলেন মাতৃহত্যা করে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য তাঁকে তপস্যা করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে লাখিমপুরেরই এক কুণ্ডে। তপ্যসা করে মাতৃহত্যাজনিত মহাপাপ থেকে মুক্ত হলেন পরশুরাম। তারপর থেকে এই কুণ্ড সমগ্র ভারতে প্রখ্যাত হলো পরশুরাম কুণ্ড নামে।

মণিপুর
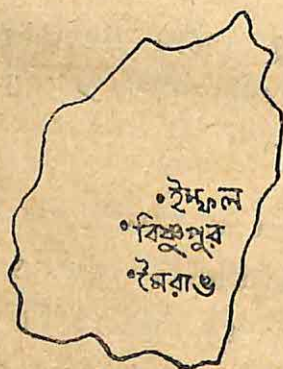
অশ্বমেধের ঘোড়াকে ধরে রাখার দুর্লভ সাহস যে বালক

বীর দেখাতে পেরেছিল সে হলো অর্জুনের বভ্রুবাহন। মণিপুর তাঁরই জন্মভূমি। কিন্তু যে জন্য মণিপুরের আজ নাম, তাহলো সেখানকার আশ্চর্য নৃত্যলালিমা।

ত্রিপুরা

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদৌ দেবতা ত্রিপুরা-মাতাঃ
ভৈরবঃ ত্রিপুরেশ্চ সর্বভীষ্ট ফলপ্রদাঃ ॥

এই রাজ্যে পড়েছিল সতীর দক্ষিণপদ। তাই ত্রিপুরা হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র একটি পীঠস্থান। অত্যন্ত প্রাচীন এই ত্রিপুরার ইতিহাস। তিনহাজার বছর আগে রাজা যযাতি তাঁর পুত্র দ্রুহ্য যেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন তাই হলো বর্তমানের
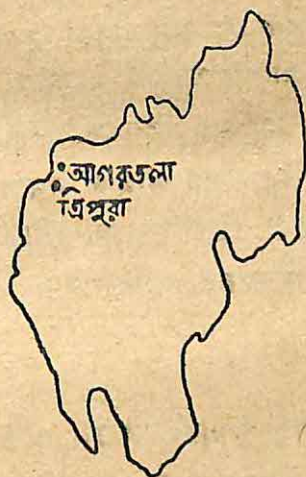
ত্রিপুরা। দ্রুহ্যের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর তাঁর বংশধর রাজা ত্রিপুর নিজের নামানুসারে এই রাজ্যের নাম রাখেন ত্রিপুরা। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালেই ত্রিপুরার শ্রীবৃদ্ধি

ঘটে। শেষ রাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য বাহাদুরের সময়েই ত্রিপুরার ভারতভূক্তি বিষয় সম্পূর্ণ হয়।

নেফা

নেফা পুরো নাম হলো উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল। ১৯৬২ সালের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ারদিকে পর্যন্ত ভারতবর্ষের যে দুরধিগম্য পার্বত্য প্রদেশের কথা আমাদের বিশেষ জানাছিল না, সেই নেফার প্রতি সারা ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ হলো ১৯৬৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কামেঙ বিভাগে চীনাদের সুপরিকল্পিত অভিযানের পর।

সুদূর অতীতে একদা যে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল হিমালয়ের পাদদেশস্থ এই নেফার বিস্তীর্ণ পার্বত্য ভাগে তার প্রমাণ কামেঙ বিভাগের ভালুকপঙের দূর্গের ভগ্নাবশেষ, লোহিত বিভাগের ভীষ্মক নগরে রাজা ভীষ্মকের প্রাচীন রাজধানীর নানা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আর তাম্রেশ্বরী-দেবীর তাম্র নির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

ব্রহ্মদেশ

হিমালয় হতে কন্যাকুমারী, গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ—সেই তো মোদের ধ্যানের ভারত, সেই তো মোদের পুণ্যদেশ।

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষের সংগে যুক্ত করেই চিরকাল আমাদের ধ্যানের ভারতের পরিপূর্ণ প্রকাশ পেয়ে এসেছে। ব্রহ্মদেশের সাথে ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগ

বহু প্রাচীনকালের। গভীর আত্মীয়তার সূত্রে যে রাজ্য ছিল একদিন ভারতেরই অঙ্গীভূত, শত্রুর কূটচক্রান্তের ফলে সে আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন।

কোহিমা

নাগারাজ্যের অন্যতম শহর এই কোহিমা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এই শহরটি চিরকাল যুক্ত হয়ে গেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ—কোহিমার আকাশকে একদিন কম্পিত করে ঘোষণা করেছিল—"Give me blood and I will give you freedom." সে বাণী ব্যর্থ হয়নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে ঢেলে দিয়েছিল তাঁদের তাজা রক্ত। এই রক্তের বিনিময়ে নেতাজী তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন

স্বাধীনতা। কোহিমার আকাশে সেদিন উড্ডীন হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী। ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামে কোহিমা তাই একটি বিশিষ্ট নাম হয়ে চিরকাল ভারতবাসীর অন্তরে আঁকা থাকবে।

গঙ্গাসাগর

সাগরতীর্থ গঙ্গাসাগর।

ফেনিল ঢেউ কূলেকূলে বারবার ভেঙ্গে পড়ছে। জল ছলছল সাগরের বুকে নিরন্তর এমনি খেলা। এই সাগরের কোলে ছোট্ট দ্বীপ। সেখানেই বিখ্যাত কপিলমুনির আশ্রম। আসমুদ্র হিমাচলের অগণিত নরনারী প্রচণ্ড শীতকেও উপেক্ষা করে এখানে ছুটে আসেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে একবার স্নান করার জন্য এই গঙ্গাসাগরের বুকে মকর সংক্রান্তির পুণ্যক্ষণে।

গঙ্গাসাগর সাগরতীর্থ হলো আসলে ভারততীর্থ। কত রাজ্যের মানুষ সেদিন এখানে জড়ো হয়। তাদের কত ঢং-এর পোশাক, কত না তাদের ভাষা! তবুও সাগরতীরে সারা-ভারত হাজির। সমগ্র দেশ সেদিন একাত্ম। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কামরূপ কেউ বাদ নেই। সেদিন সবাই এসে মিলিত হয়েছে সবার পরশে তীর্থ সেরা এই সাগর তীর্থ গঙ্গাসাগরে।

পুরী

সামনে দিগন্ত বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর; অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ রশ্মির ছোঁয়ায় উদ্বেল জলরাশির বুকে বুকে রক্ত রঙের মাতামাতি। বিরহশঙ্কিত সাগর আর বিদায়ী সূর্য্যের সে এক আবেগ কম্পিত বর্ণাঢ্য মুহূর্ত।

পুরীধাম শ্রীক্ষেত্র॥ ভগবান শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠ-গুলির অন্যতম মঠ এখানেই অবস্থিত। সমুদ্রতীর থেকে সোজা রাস্তা চলে গেছে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির পর্যন্ত। সমুদ্রস্নান সেরে মহাপুণ্য সঞ্চয় করে যেখান থেকে প্রথম পদক্ষেপ সুরু হবে চরম পুণ্যঅর্জনের পথে—মহাপ্রভুর দর্শনে চলার আরম্ভ হলো যেখান থেকে,—সেইই স্বর্গদ্বার।

পুরী যেমন বায়ু পরিবর্তনের স্থান তেমনি তীর্থস্থানও বটে। এখানে সমুদ্রও আছে, জগন্নাথও আছেন। একে দেখ, ওঁকেও দর্শন কর। প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ কর, অপ্রাকৃতকেও প্রণাম জানাও। একটিকে ছেড়ে অপরটিতে মন উঠবে না। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা উভয় পাদপীঠেই প্রণত হন।

কোনারক

পুরী থেকে একুশ মাইলের মধ্যেই কোনারক। কোনারক সূর্যমন্দির পৃথিবীর তাবৎ শিল্পভাণ্ডারের অতি উজ্জ্বল একটি কৌস্তুভরত্ন। দেখলে নয়ন সার্থক হয়। বিমুগ্ধমন বিশুষ্ক নীরস পাষানগাত্রে একটি কালজয়ী কবিতা পাঠ করার আনন্দে বিভোর হয়ে উঠে। তবুও তো সমগ্র মন্দিরটা আজ আর নেই। মুল মন্দিরটা অদৃশ্য হয়ে গেছে একদিন। আজ যা আছে তা সেই সূর্যমন্দিরের 'জগমোহন'। কিন্তু ঐ জগ-মোহনই জগতমোহন। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। ভোলা যায় না সারাজীবনেও।

ভুবনেশ্বর

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরই প্রধান। মন্দিরের উচ্চতা

দেড়শত ফুটের উপর। লিঙ্গরাজ মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরের ভাস্কর্যশিল্পের নিপুণতা দেখলে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে ভারত শিল্পকার্যে ও স্থপতিবিজ্ঞানে কতদুর অগ্রসর ছিল। পূর্ব ভারতের একটি বিশেষ তীর্থক্ষেত্র এই ভুবনেশ্বর।

বালেশ্বর

"অধীন ভারত করিল প্রথম
স্বাধীন ভারত মন্ত্র পাঠ,
বালাশোর বুড়ী বালামের তীর
নব ভারতের হলদিঘাট।"

বালেশ্বরের বুড়ী বালামের তীরেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল 'নব ভারতের হলদিঘাট'। মদমত্ত ইংরেজ শাসনকে ধূলায় গুড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল যাঁরা, তাঁরা সেদিন ইতিহাস রচনা করে গেল এই বালেশ্বরে। বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন আর নীরেন সেদিন এই বালেশ্বরে যে নির্ভীক সাহসিকতার সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা অমর হয়ে থাকবে চিরকাল।

চিতোর

রাজস্থানের বুকে যেন একটি অটল প্রতিজ্ঞা; একটি কঠিন শপথ—একটি অনমনীয় দৃঢ়তার নাম চিতোর। রাজা প্রতাপসিংহই যাঁর একমাত্র তুলনা। চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার অটুট সংকল্প নিয়ে যাঁর নেতৃত্বে হলদিঘাটের রণাঙ্গণে লক্ষ

লক্ষ হিন্দুসন্তান। ইতিহাস তাঁদের কোনদিন ভুলবে না, ভুলতে পারে না। শত শহীদের প্রাণের রক্তরাঙা আত্মবলিদান জাতিকে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা দেবে অনন্তকাল। বশ্যতা স্বীকারে, অধীনতাবরণে সীমাহীন ঘৃণার উদ্রেক করবে চিরদিন।

পুষ্কর

মাড়োয়ার প্রদেশের রাজধানী আজমীর। এরই সাত-মাইল দূরে প্রসিদ্ধ পুষ্করতীর্থ। পুষ্কর প্রাচীনতম তপভূমি। পঞ্চ তীর্থের অন্যতম। এখানে একটি বিশাল হ্রদ আছে। রানী অহল্যাবাঈ এই হ্রদের চারিদিকে ঘাট নির্মাণ করে দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তিন মাইল দূরে সাবিত্রী পাহাড়। পাহাড়ের উপর মন্দির। ভারতের মধ্যে এই একমাত্র তীর্থ, যেখানে কেবলমাত্র মহিলারাই পূজার অধিকারী। একসময় ব্রহ্মা শ্রীরাধার দর্শনলাভের জন্য কঠোর তপস্যা এবং যজ্ঞ করেছিলেন পুষ্করে। সেকারণেই এই স্থানের বিশেষত্ব। কার্তিক শুক্লা-একাদশী থেকে রাস পূর্ণিমা পর্যন্ত বিরাট মেলা হয় এখানে। ভারতের নানাস্থান থেকে বহু যাত্রীর সমাগম হয় তখন। যাত্রীরা এই তীর্থে পূর্ব-পুরুষের মুক্তি কামনায় শ্রাদ্ধাদি করে থাকে।

আবু পাহাড়

আবু পাহাড়ের শুদ্ধ নাম অর্বুদ পর্বত। এই পর্বতের একটি গুহার মধ্যে অর্বুদাদেবী বিরাজমানা। দেবীর নামে এই পর্বতের নাম হয়েছে অর্বুদা পর্বত।

রাজস্থানের ইতিহাসে আছে ঃ ঋষিগণ অর্বুদশিখরে তপস্যা

করতেন। তাঁরা বন্য ফলমূলে জীবনধারণ করতেন। দৈত্যগণ তাঁদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাত। ওদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঋষিগণ যজ্ঞ করলেন। এতে অত্যাচারের দমনতো হলই না, বরং তা আরও বেড়ে গেল। তখন ঋষিগণ ধর্মকর্মে বিরত না হয়ে হোমানল জ্বেলে শিব-ধ্যানে রত হলেন। এই হোমানল থেকে এক সুপুরুষের আবির্ভাব হল। ঋষিগণ তার নাম রাখলেন পরিহর। তাকে তাঁরা প্রহরীর কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তার দ্বারাও কোন কাজ হল না। পরপর আরও দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তাদের নাম হল "শোলাঙ্কি"। তারাও প্রহরীর কাজে নিযুক্ত হল। কিন্তু তাদের কেউই ঋষিদের এই বিপদ থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হল না।

উপায়ান্তর না দেখে বশিষ্ঠদেব বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হোমানলে আহুতি প্রদান করলেন। দেখতে দেখতে শস্ত্র-ধারী এক বীরপুরুষের আবির্ভাব হল। ঋষিগণ তাকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে "চৌহান" নামকরণ করে শত্রু নিধনে আদেশ করলেন ও কালিকাদেবীর স্তব করতে লাগলেন। মা স্তুতিতে সন্তুষ্টা হয়ে সিংহবাহিনীরূপে আবির্ভূতা হয়ে অভয়বাণী প্রদান করে তিরোহিতা হলেন। মহামায়ার আশির্বাদে "চৌহান" দৈত্যগণকে নিহত করে শান্তিস্থাপন করলেন। অতঃপর ঋষিগণও নিশ্চিন্তমনে ব্রহ্মধ্যানে তৎপর হলেন। এই চার পুরুষ অগ্নি হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে এঁদের অগ্নিকুলোদ্ভব বলা হয়ে থাকে। এঁদেরই বংশধরগণ রাজপুত

নামে পরিচিত। আর ঐ দেবীই তাদের অধিষ্ঠাত্রী বা ইষ্টদেবী ঃ তিনি আবু দাদেবী।

সোমনাথ (প্রভাসতীর্থ)

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত এই প্রভাস-তীর্থ। এই প্রভাস গ্রামে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে রানী অহল্যাবাঈ প্রতিষ্ঠিত সোমনাথ মন্দির। মন্দিরের ঠিক মাঝ-খানেই সোমনাথ শিবলিঙ্গ—দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। আদি সোমনাথ মুসলমানদের কবজ পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় অহল্যাবাঈ এইমন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শিবলিঙ্গের ডানদিকে পার্বতীর মন্দির। পাশেই শংকর মঠ।

ভগ্ন সোমনাথের আদি মন্দির সমুদ্রের এত নিকটে যে, সমুদ্রের তরঙ্গমালা প্রাঙ্গন-প্রাচীরের পাদদেশে অনবরত প্রতিহত হচ্ছে। এই সেই মন্দির যার উপর গজনীর সুলতান মামুদ পরপর সাতবার আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে বিগ্রহ আর মন্দিরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী সোমনাথ সব আক্রমণকে প্রতিহত করে আজও দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নতমস্তকে। আজও দূরদুরান্তের মানুষ এখানে ছুটে এসে পূর্ণ্যস্মৃতি বিজরিত এই মন্দির-প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ভগবানের স্নেহাশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়ে পুলকিত হচ্ছে।

দ্বারকা

সিন্ধুসাগরের সন্নিকটে দ্বারাবতীপুরীই হল দ্বারকা। একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে এখানেই প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন তাঁর রাজধানী। দ্বারকাধীশ্বর শ্রীরণছোড়রায়জীর বিশাল উত্তুঙ্গ মন্দিরই দ্বারকার প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। শংকরাচার্যের সারদামঠও এই দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত। সপ্তমোক্ষপুরীর অন্যতম এই দ্বারকা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান।

নাসিক

নাসিককে বলা হয় দক্ষিণ কাশী। নাসিকের নিকটেই বিখ্যাত ত্র্যম্বেকেশ্ব জ্যোতির্লিঙ্গ। গোদাবরীর উৎগমস্থল। রামচন্দ্রের বনবাসকালের নিবাসস্থান। পঞ্চবটী নাসিকের কাছেই। কুম্ভমেলার জন্য এই ক্ষেত্র হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র তীর্থভূমি।

পুণা

মোগল বাদশাহের নির্মম অত্যাচারে হিন্দুসমাজ যখন সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার পথ পাচ্ছে না, হিন্দুসমাজ ধর্ম-সংস্কৃতির যখন ঘটছে চরম অবমাননা, সেই দারুণ দুর্দিনে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হল এক তেজোদৃপ্ত সূর্য। হিন্দুকুলতিলক ছত্রপতি শিবাজী সেই নবোদীপ্ত ভাস্কর। এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দেবার দুর্জয় সংকল্প ছিল যার হৃদয়ে। পুনাকে কেন্দ্র করেই সেই অখণ্ড হিন্দুসাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

প্রতাপগড়

মহারাষ্ট্রের শৈলাবাস মহাবালেশ্বর থেকে ১২ মাইল দূরে এই প্রতাপগড় কেল্লা। শীতের রাত। রুক্ষ সাতপুরা পর্বত

মালার বুকে হিমেল হাওয়ার প্রথম শিহরণ লেগেছে। এই রাতে এই প্রতাপগড়দুর্গে একটি ঘরে একজন খর্বকায় ব্যক্তিকে অশান্ত পদচারণা করতে দেখা গেল। সবাই তখন ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু এই লোকটির চোখে।

—"এইভাবে শান্তি কিনতে পারবো না, এ অসম্ভব।" তাকে বলতে শোনা গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন বাইরের অন্ধকারের দিকে। শেষ বিজাপুর সুলতানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে, এক সাধারণ জায়গীরদার এই হবে আমার পরিচয় ? অসম্ভব! স্বাধীন হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাহলে স্বপ্নই থেকে যাবে! না, না, তা হতেই পারে না। চাই না শান্তি, কিন্তু মন্ত্রীরা যে বলছে সন্ধি করতে! আফজল খাঁর মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। বিজাপুরকে এখন চটানো ঠিক হবে না। মোগলের মুখোমুখী হতে হলে বিজাপুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব দরকার। সবই বুঝি, কিন্তু কি করব! কি করে বিশ্বাস করি এই আফজল খাঁকে। এরই মধ্যে দু'দুটো হত্যা করেছে বন্ধুভাবে আলোচনা করার ছল করে! আমাকেও নাকি ডাকতে চায় আলোচনা করার জন্য। তার মানে আমাকেও মারতে চায়। 'হে ভবানী, তুমি বলে দাও আমি কি করব ?'

প্রদীপের শিখাগুলি ম্লান হতে হতে অন্তর্হিত হলো। বাইরের অপেক্ষমান অন্ধকার হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। হঠাৎ সেই অন্ধকারে আবির্ভূতা হলেন এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি।

—ভয় নেই শিবা, আফজলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তোমার জয়লাভ সুনিশ্চিত।

মূর্তি অদৃশ্য হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী ধড়-মড়িয়ে উঠে বসলেন। এ কি স্বপ্ন দেখলাম! একি সত্যি?" ছুটে গেলেন তিনি দেবী ভবানীর মন্দিরে। আমি জানতাম মা, তুমি আমায় বাঁচাবে, আমি জানতাম। পরের দিন সকালে জরুরী সভা আহ্বান করা হলো। শিবাজী দৃঢ় পদক্ষেপে সভাকক্ষে প্রবেশ করে বললেন ঃ

—"সভাসদগণ আপনাদের পরামর্শমত বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি করতে আমি অক্ষম। সারারাত চিন্তা করে আমি এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে। আমার দেশের স্বাধীনতা আমি কোনমতেই খর্ব করতে পারবো না। বিজাপুরের গোলাম হওয়ার আগেই আমি মৃত্যু বরণ করবো, তবু যুদ্ধকে আমি বিসর্জন দিব না। এখন বলুন, আপনারা কি চান? যুদ্ধ না, শান্তি?

—'আমরা যুদ্ধই চাই, আমরা যুদ্ধই চাই' বলে ফেটে পড়লো সভাকক্ষ মিলিতগর্জনে।

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে........বলে গান ধরলেন সভাকক্ষ।

শিবাজী বললেন, দেবী ভবানীর আশীর্বাদের কথা। প্রস্তুতি সুরু হল বিজাপুরের সঙ্গে মোকাবেলা করার। তারপর রাজমাতা জীজাবাঈ-এর আশীর্বাদে ধন্য হয়ে কিভাবে শিবাজী আফজল খাঁর সমস্তরকমের অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে

দিয়ে প্রতাপগড়দুর্গের পাদদেশে একটি বার মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন। সেই ইতিহাস আজ আর কারো অজানা নেই।

সে-ইতিহাস বিশ্রুত কাহিনীর ঐতিহাসিক হত্যার মুক সাক্ষীরূপে আজও দণ্ডায়মান হয়ে আছে প্রতাপগড়ে। সম্প্রতি সেখানে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে অশ্বারূঢ় তেজোদৃপ্ত শিবাজীর মূর্তির উদ্বোধন হওয়ায় আমাদের বিজয় গৌরবের স্মৃতি আবার জেগে উঠল। সেই সঙ্গে জেগে উঠলো বিস্মৃতপ্রায় প্রতাপগড়ের ঐতিহাসিক মহত্ত্ব।

রায়গড়

রায়গড়ে সম্পন্ন হয়েছিল শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া। হিন্দুসমাজের কাছে সে এক বিশেষ গৌরবের দিন। শিবাজীর দেহত্যাগ এই রায়গড়েই।

নাগপুর

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ারের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত এই নাগপুর শহর। দধিচীর আত্মত্যাগ আর শিবাজীর কর্মোদ্যমে গড়ে উঠেছিল যাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধনে হিন্দুসংগঠনই ছিল যাঁর জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র, সেই ডাক্তারজীর 'স্মৃতি সমাধি' এই নাগপুরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিটি হিন্দুর কাছে আজ পরমপবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পবিত্র সমাধিকে কেন্দ্র করে আজও গীত হচ্ছে সেই অমর সঙ্গীত।

গণ্ডোয়ানা

উড়িষ্যার পশ্চিমে আর মধ্যপ্রদেশের উত্তরদিকে রানী দুর্গাবতীর স্মৃতি বিজড়িত এই গণ্ডোয়ানা প্রদেশ।

গণ্ডোয়ানার বৈষ্ণব রাজা দলপতি রায় মারা গেলেন। সিংহাসনে রেখে গেলেন পাঁচ বছরের নাবালক পুত্র বীর নারায়ণকে। পাঁচ বছরের বালক কি করে রাজ্য শাসন করবেন! শত্রুরা সুযোগ খুঁজতে লাগল। রাজমাতা দুর্গাবতী বুঝতে পারলেন পিছনে ফেউ লেগেছে। তারা বালক রাজাকে হঠিয়ে দিতে চায়।

দিল্লীর সিংহাসনে তখন সম্রাট আকবর। শুনলেন, ধনধান্যপুষ্পে ভরা ছোট একটি বসুন্ধরার কথা; নাম যার গণ্ডোয়ানা। শুনে আকবরের লোভী মন আনন্দে নেচে উঠল। এ রাজ্যটি তাঁর চাই-ই। সম্রাট ডেকে পাঠালেন তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি আবদুল মজিদ আসব্ খাঁকে। বললেন, "আসব্ খাঁ, এই গণ্ডোয়ানা রাজ্যটি তোমাকে জয় করতেই হবে। সৈন্য-অস্ত্র প্রভৃতি যা প্রয়োজন সঙ্গে নিয়ে অবিলম্বে রওনা হও।"

দুর্দান্ত নিষ্ঠুর এই আসব্ খাঁ। তার লোভী হাতের ভয়াবহ দশ আঙুলের কালছায়া শকুনের মত আকাশে উড়ছে! কতক্ষণই বা লাগবে এ রাজ্যটিকে শ্মশানে পরিণত করতে!

আসব্ খাঁর আগমন সংবাদে গণ্ডোয়ানার সর্বত্র উঠল পালাই পালাই রব।

—'না। কেউ পালাবে না। কেউ রাজ্য ছেড়ে কোথাও যাবে

না। কেন পালাবে? তোমাদের এতকালের ঘরবাড়ী পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে শত্রুর ভয়ে পালাবে? কখনই নয়। সবাই তৈরী হও। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন রানী দুর্গাবতী। আমারা যুদ্ধ করব। কি ভেবেছেন দিল্লীশ্বর! কি ভেবেছেন আসব্ খাঁ? এর উচিত জবাব আমরা দেবই। সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হও। হয় রাজ্যরক্ষা, নয় একইসঙ্গে মৃতুবরণ।'

রানী দুর্গাবতীর কথায় সবাই চমকে উঠল। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। প্রাণে বল পেল। বুকে আশার ঝিলিক দিল। বাহুতে শক্তি ফিরে এল। ভীরু মেষের মত তারা এখন বাঁচতে চায় না। রানীর ডাকে দেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সব প্রজাই এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

শয়তান আসব্ খাঁর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি পাক খেতে লাগল। কি করে দুর্গাবতীকে জব্দ করা যায়! কি করে গণ্ডোয়ানা চুরমার করা যায়! চর পাঠিয়ে খবর নিলেন আসব্ খাঁ। রানী সব সৈন্যদের রাজধানীতে দুর্গের মধ্যে একত্রিত করে শক্তি দৃঢ় করছেন। আসব্ খাঁ তার সৈন্যদের আদেশ করলেন, গণ্ডোয়ানায় সমস্ত সৈন্য দুর্গে একত্র হয়েছে। তোমরা গ্রামে গ্রামে লুঠ কর, অত্যাচার কর, আগুন দাও ঘরে ঘরে। ঘর থেকে খাবার জিনিসপত্র আর মেয়েদের টেনে বের কর। অপমান কর। সকলের উপর সমান অত্যাচার চালাও, দেখি কি করে সব সৈন্য দুর্গে বসে থাকে।

আসব্ খাঁর চালে ভুল হয় নি। অত্যাচারের খবর পেয়ে যেসব প্রজারা দুর্গের মধ্যে জড় হয়েছিল তারা নিজেদের

ঘরবাড়ী সামলাবার জন্য চলে যেতে চাইল। রানীও কম ধুরন্ধর নন। তিনি কিছু সৈন্যকে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। আসব্ খাঁর শক্তি ছত্রাকার করে দিলেন। আসব্ খাঁ এইবার বন্যার বেগে সৈন্য ছুটিয়ে দিলেন দুর্গের দিকে। দুর্ভেদ্য নর্হী দুর্গে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া রানী দুর্গাবতীর কাছে আর অন্য কোন পথ খোলা থাকল না। সসৈন্যে রানী গিয়ে আশ্রয় নিলেন নর্হী দুর্গে। এদিকে হু হু করে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে মোগলসৈন্য। আসব্ খাঁর বাহিনী গিরিসঙ্কটে পেঁছুতেই রানী তাঁর শক্তিশালী সুশিক্ষিত ছোটবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রানীর আক্রমণের মুখে আসব্ খাঁ সারাদিন বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করেও শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারলেন না। অগত্যা আসব্ খাঁকে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাকী সৈন্য নিয়ে সরতে হল। দুর্গাবতীর এই বিজয় সংবাদ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাসে অমর হয়ে রইল এই হিন্দু রমণীর বীরত্বগাথা।

অমরকণ্টক

বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর সর্বোচ্চ অধিত্যকা এই অমৃতিভূমি অমরকণ্টক। প্রাচীন ভারতের এই তপভূমি মার্কেণ্ডেয় তপস্যা-ক্ষেত্র। এখানেই ঘটেছিল মহর্ষি কপিল, ভৃগু, অত্রি, জামদগ্নি, সাধক কবিদের সিদ্ধিলাভ। মহাকবির মেঘদূত খণ্ডকাব্যে অমরকণ্টকের অতুলণীয় সৌন্দর্য্যঝঙ্কার তরঙ্গায়িত পর্বত শ্রেণী, গহন অরণ্য এবং শোন, নর্মদা, আরপি, জোহিলা, কর-গঙ্গা, নদ-নদীর উৎস বর্ণিত আছে। এই স্থানটির বিস্ময়কর সৌন্দর্যে তীর্থ যাত্রীরা মোহিত না হয়ে পারেন না।

ঝাঁসী

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে চিরযুক্ত একটি অমর নাম ঝাঁসী। আঠারশ' সাতান্নের সংগ্রামে প্রবল ব্রিটীশ শক্তির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল একটি বীরাঙ্গনার সুতীব্র কণ্ঠস্বর—"মেরী ঝাঁসী নেহী দেউঙ্গী।" বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন এই ঝাঁসীর রানী। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র মধ্য ভারতের নেতৃত্বের ভার ছিল যাঁর সবল হাতে।

উজ্জয়িনী

প্রাচীন অবন্তিকারই অন্যনাম উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী ভারতের মোক্ষপুরী। ভগবান শংকরের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি মহাকাল শিবলিঙ্গের মহান পীঠস্থান এই উজ্জয়িনী। এইস্থান শক্তিপীঠও বটে। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকদের বিতাড়িত করে উজ্জয়িনীকে করেছিলেন শত্রুমুক্ত। কালে উজ্জয়িনী কলাবিদ্যার অন্যতম কেন্দ্রস্থান হয়ে উঠেছিল। মহাকবি কালিদাস, বররুচী, ভর্ত্তহরি ভারবি প্রভৃতি কবিগণ, ও সাহিত্যিক মহারথীদের পুণ্যস্মৃতির সাথে এই অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী সংযুক্ত। এখানেও অনুষ্ঠিত হয় সুপ্রাচীন কুম্ভ-মেলা। তাই হিন্দুদের কাছে এ এক পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

বিজয়নগর

রামায়ণে আমরা যে কিষ্কিন্ধ্যার কথা পেয়েছি তারই মাটির উপর একদিন গড়ে উঠেছিল এই বিজয়নগর রাজ্য। শংকরাচার্যের শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য ব্রাহ্মণমাধব বিদ্যারণ্য। তাঁরই

বুদ্ধি ও কৌশলে এই ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য একদিন মহিমান্বিত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যারণ্যের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম ছিল বিদ্যানগর। কালে তারই নাম হয়েছিল বিজয়নগর। ইতিহাসে বিদ্যানগরের সঙ্গমবংশের উল্লেখ আমরা পাই। সঙ্গম নামে এক ক্ষত্রিয়ের হরিহর ও বুকক নামে দুই পুত্র ছিল। হয়সালবংশ লোপের পর মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছিল বিদ্যানগরের সঙ্গমবংশ। কৃষ্ণার দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বিদ্যানগর রাজ্য। তখনই তা বিজয়নগর নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। হরিহর ও বুককের পর রাজা হলেন দ্বিতীয় দেবরায়। সঙ্গমবংশের পর শালুববংশ তারপর তুলুববংশ। বীর নরসিংহ কৃষ্ণদেব রায়ের আমলেই বিজয়নগরের চরম সমৃদ্ধি। বাহমণি রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের সংগ্রাম হয়েছে বহুকাল ধরে। অবশেষে সদাশিব রায়ের মন্ত্রী রামরাজার উদ্ধত অহংকারের জন্য এই শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। যে বিজয়নগর ছিল একদিন ইতিহাসের গৌরব, সেই বিজয়নগর আজ ইতিহাসের মহাশ্মশান। মহীশূরের হাম্পিতে গেলে আজও বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখে পড়ে।

হাম্পিতে আছে বিঠল স্বামীর মন্দির। এখানকার পাথরের রথটি সত্যই অপূর্ব। রাজাকৃষ্ণদেব রায়ের তৈরী এই রথকে একসময়ে রথের মতোই ব্যবহার করা হতো। মূল মন্দিরের চারধারে আরও পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত গৃহ। কী সুন্দর ভিত্তি আর খাঁজে খাঁজে অপূর্ব সব কারুকার্য। মানুষ কত যত্নে কত ধৈর্যে এমন কাজ করতে পারে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়!

মেলকোট

মহীশূর শহর থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এই মেলকোট। এর অন্যনাম যাদুগিরি বা নারায়ণপুরম। চারযুগে এর চারটি নাম। সত্যযুগে নারায়ণাদ্রি, ত্রেতাযুগে বেদাদ্রি, দ্বাপরযুগে যাদবাদ্রি এবং কলিযুগে যতি শৈল। আচার্য রামানুজ মেলকোটে মন্দির নির্মাণ করে মহা-লক্ষ্মীর পূজার ব্যবস্থা করেন। আচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যতিরাজ মঠ এখনও এখানে বিদ্যমান। এখানে রামনুজের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। আচার্যের জীবদ্দশায় তাঁর যে তিনটি প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এটি তার একটি। দ্বিতীয় মূর্তিটি মাদ্রাজের কাঞ্জিভরমে এবং তৃতীয়টি অন্ধ্রের শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রবণবেলগোলা

শ্রবণবেলগোলা জৈনতীর্থ। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন পরিত্যাগ করে শেষ জীবন এখানেই অতিবাহিত করেছিলেন। সম্রাট অশোকও এস্থান পরিদর্শন করেছিলেন। হাজার বছর আগে গঙ্গাবংশের রাজত্বকালে জৈনধর্ম খুবই প্রচার লাভ করেছিল। তাঁদের সময়েই শ্রবণবেলগোলা দক্ষিণদেশে জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। শ্রবণবেলগোলায় গোমতেশ্বরের যে বিরাট মূর্তি আছে গঙ্গারাজ রাজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ডা রায়ের আমলেই তা নির্মিত হয়েছিল।

ইন্দ্রগিরি পাহাড়ের উপর এই গোমতেশ্বরের মূর্তি। মূর্তি যে এমন বিরাট হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা

যায় না। শ্রবণবেলগোলার এই মূর্তির জুড়ি পৃথিবীর আর কোন দেশেই নেই। এই মূর্তি দেখলে মনে স্থির প্রত্যয় হয় যে, একটা বিরাট উঁচু পাথর ঐ ইন্দ্রগিরি পাহাড়েই ছিল; তাকেই কেটে খোদাই করে এই মূর্তির অবয়ব তৈরী হয়েছে। সাতান্ন ফুট উঁচু এই মূর্তি আমাদের কাছে আজও একটা বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার বছরের জলঝড় এই মূর্তির উপর দিয়ে বয়ে গেছে কিন্তু তবুও মূর্তিতে একটা আঁচড় নেই, দাগও লাগে নি কোথাও। আজও দেখলে মূর্তিটিকে সদ্য নির্মিত বলেই মনে হয়।

এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব হলো মস্তকাভিষেক। চৌদ্দ বছর পর পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের সমস্ত জায়গা থেকেই লক্ষ লক্ষ লোক আসে এই উৎসব দেখতে। তখন পাহাড় আর পাহাড় থাকে না, সবকিছু মানুষে ঢাকা পড়ে যায়।

বেলুর

বেলুরের পৌরাণিক নাম হলো বেলপুর। ঐতিহাসিক নামও তাই। হয়সালবংশের রাজা বিষ্ণুবর্মণ জৈনধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। বেলুরের চেন্নকেশব বিষ্ণুমন্দির তাঁরই কীর্ত্তি। এই প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের সৌন্দর্য আজও অগণিত যাত্রীকে আকর্ষণ করছে। বেলুর মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য আমাদের বিস্মিত করে। পাথরেরও যে প্রাণ থাকতে পারে এই মন্দিরের কারুকার্যগুলি দেখার পর তা আর অবিশ্বাস হয় না। মন্দিরের দেওয়ালে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত

অপর্যাপ্ত কারুকার্যমণ্ডিত। অদ্ভুত জীবনন্ত সব মূর্তি। কোথাও বা হাতীর সারি, কোথাও বা নানাধরনের ফুলপাতা, কোথাও বা নৃত্যপরা নারীমূর্তি আবার কোথাও বা দেবতার মূর্তি। একবার চোখ পড়লে আর যেন চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

হালেবিদ

ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের অপরূপ সৌন্দর্য চেতনার নিদর্শন হলো হালেবিদের মন্দির। জীবনের আনন্দ আর বেদনা যেন একাকার হয়ে এই মন্দিরে প্রকাশ পেয়েছে। এমন প্রাণবন্ত শিল্পচর্যা বুঝি ভারতের আর কোন মন্দিরেই ঘটে নি। এই মন্দিরের সংগে জড়িয়ে আছে হয়সাল রাজ-বংশের ঐতিহাসিক কীর্তি আর সেই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় সেই অদ্ভুতকর্মা শিল্পস্থপতি জখনাচারির কথা। মহীশূরের বেলুর, হালেবিদ আর সোমনাথপুর এই তিনটি শ্রেষ্ঠ মন্দির তাঁরই পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষের সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে এই তিনটি মন্দির।

হালেবিদ অসম্পূর্ণ মন্দির। আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের দক্ষিণ-ভারত অভিযানের সময় হয়সাল রাজাদের রাজধানী দ্বারসমুদ্র লুণ্ঠিত হয়। ফলে আশি বছর ধরে যে মন্দিরটির নির্মাণকার্য চলছিল তা সম্পূর্ণ হবার আগেই ধ্বংস হয়ে যায়। এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও যেটুকু অবশেষ সম্বল করে হালেবিদের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে তাই-ই দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদনে যথেষ্ট। এখানেও সেই হাতির

সারি, সিংহ আর ঘোড়সাওয়ার, পৌরাণিক পশুপাখি আর ফুল লতা পাতা। আরও আছে পুরাণের নানা কাহিনীচিত্র। ছোটখাটো চিত্র এঁকে শিল্পীরা সন্তুষ্ট হন নি, বড় বড় মূর্তিও তাঁরা গড়েছেন। মূর্তিগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি আবার বৈচিত্র্যময়। এদের মধ্যে আছে রামায়ণ, মহাভারত এবং শিবপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের অনেক চিত্র। রাম-রাবণ, কর্ণার্জুনের যুদ্ধ, ক্ষীরসমুদ্রমন্থন, কৃষ্ণচরিত্র সবই সুচিত্রিত।

তালকাবেরী

প্রাকৃতিক দৃশ্য বিমণ্ডিত কুর্গ হলো মহীশূর রাজ্যেরই একটি পার্বত্য জেলা। এই জেলার সর্বোচ্চ শিখরের নাম ব্রহ্মগিরি। এই ব্রহ্মগিরি থেকেই কাবেরী নদীর উৎপত্তি। আশ্বিনের তুলা সংক্রান্তিতে এই উৎপত্তিস্থানে মেলা হয়। তখন দলে দলে হিন্দু সেখানে আসেন অবগাহন করতে। কাবেরীর এই উৎপত্তিস্থানের নামই হলো তালকাবেরী। দুধারে বনরাজির মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-ভারতের এই পবিত্র নদী প্রায় চারশত সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। কাবেরীর উভয় তীরে বহু পুণ্যতীর্থ বিরাজমান। দক্ষিণীরা এই নদীকে গঙ্গার সমকক্ষ বলেই মনে করে। তালকাবেরী শুধু ধর্মেই নয়, সৌন্দর্যেরও তীর্থ।

সীমাচলম্

সুন্দর তীর্থ এই সীমাচলম্। এখানে আছে নৃসিংহের মন্দির। যে পাহাড়ের উপর এই তীর্থ তাকে সিংহগিরি বলে। আটশো ফুট একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর এই তীর্থস্থান।

প্রহলাদ ছিল হিরণ্যকশিপুর ছেলে। পরম বিষ্ণুভক্ত।
বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ
প্রাণ হারালো। হিরণ্যকশিপু তাই বিষ্ণুর প্রতি ভীষণ চটে
গেল। প্রহলাদকে বলল, 'খবরদার, আমার ছেলে হয়ে তুমি
বিষ্ণুর আরাধনা করবে না।' কিন্তু প্রহলাদ বাবার কথা শুনলো
না। বিষ্ণুপূজা তার ঠিকই চললো। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু
প্রহলাদের আচরণে ভীষণ চটে গেলেন। বললেন, 'প্রহলাদকে
সমুদ্রের জলে ফেলে দাও, আর একটা পাহাড় দিয়ে চাপা দাও
তাকে।' প্রহলাদকে এখানকার সমুদ্রে ফেলে এই সীমাচলম
পাহাড় তার উপর চাপা দেওয়া হলো। কিন্তু বিষ্ণু হলেন ভক্ত-
বৎসল। তাঁরই কৃপায় প্রহলাদ সেযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল।
এমনিভাবে হিরণ্যকশিপু অনেকবার প্রহলাদকে বধ করবার
জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিষ্ণু তাকে বারবার রক্ষা করেছিল।
শেষে ব্যর্থ হয়ে হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে প্রশ্ন করলো 'কে তোকে
বার বার রক্ষা করে?' প্রহলাদ উত্তর দিল 'হরি'। হিরিণ্যকশিপু
প্রশ্ন করলো 'কোথায় তোর হরি?' প্রহলাদ বলল, 'আমার হরি
সর্বত্র বিরাজ করেন।' সামনে একটা স্ফটিকস্তম্ভ ছিল।
হিরণ্যকশিপু তাই দেখিয়ে প্রশ্ন করলো 'তোর হরি এর মধ্যে
আছে?' প্রহলাদ নিশঙ্কচিত্তে উত্তর দিল 'হ্যাঁ আছেন।' হিরণ্য-
কশিপু রাগে পদাঘাতে সেই স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙে ফেললো। বিষ্ণু
বেরিয়ে এলেন সেই স্তম্ভ থেকে ভক্তের ডাকে। কিন্তু তিনি
তখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণু মূর্তি নন, অর্দ্ধেকটা

নরের আর অর্দ্ধেকটা সিংহের মূর্তি! নৃসিংহ অবতার। ব্রহ্মার কাছে হিরণ্যকশিপু বর পেয়েছিল যে, কোন দেবতা, নর বা পশুর হাতে তার মৃত্যু হবে না। দিনে বা রাত্রিতে নয়, জলে স্থলে আকাশেও নয়। বিষ্ণু তাই সন্ধ্যাকালে নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হয়ে হিরণ্যকশিপুকে নিজের কোলের উপর রেখে বধ করলেন। সীমাচলম্ পাহাড়ে এই নৃসিংহ দেবতার মন্দির নির্মাণ করেছে ভক্তপ্রহলাদ।

পিঠাপুরম্

গয়াতীর্থের কথা শোনবার সময় গয়াসুরের কথা জেনেছি। তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত ধার্মিক। গয়াসুরের কঠোর তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে আর স্বর্গরাজ্য যেন হাতছাড়া হয়ে না যায় এই ভয়ে দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলো গয়াসুরকে একটা বর দিয়ে সন্তুষ্ট করে তাঁকে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বলা হোক। গয়াসুর এই সুযোগে দেবতাদের কাছ থেকে এই বর চেয়ে বসল যে, তাঁর দেহ যেন পৃথিবীর পবিত্রতম বস্তু হয়। দেবতারা বললেন, তথাস্তু। এদিকে হলো আর এক বিপদ। পৃথিবীর সমস্ত পশু পাখী, পাপী-তাপী গয়াসুরের দেহ দর্শন করেই মুক্তি পেয়ে যেতে লাগলো। সকলের ভাগ্যে ঘটলো স্বর্গবাস। যমরাজের আর কোন কাজকর্মই থাকলো না। স্বর্গে ঘটলো দারুণ স্থানাভাব। তখন দেবতারা আবার পরামর্শ করে ঠিক করলো গয়াসুরের দেহকে নিশ্চল করে দিতে হবে। তখন বিষ্ণু গয়াসুরের কাছে গিয়ে বললো, 'আমাদের যজ্ঞের জন্য তোমার দেহটা দরকার, আমরা তোমার পবিত্র দেহের উপর যজ্ঞ করবো।' বিষ্ণুর প্রস্তাব শুনে ধার্মিক গয়াসুর বললো,

'সে তো আমার সৌভাগ্য প্রভু।' বলেই শুয়ে পড়লো। গয়াসুরের দেহটা ছিল বিরাট লম্বা। একশো পঁচিশ যোজন তার বিস্তৃতি। তাই তিনি যখন শুয়ে পড়লেন তখন তাঁর মাথাটা থাকলো গয়ায়, উড়িষ্যার যাজপুরে নাভি আর এই পিঠাপুরমে রইল তাঁর পা। যজ্ঞের সময় ধর্মশিলাটি তাঁর দেহের উপর রাখা হয়েছিল। তাতে বসে দেবতারা যজ্ঞ করেছিলেন। গয়াসুর সেই সময় দেবতাদের কাছ থেকে আর একটি বর চেয়ে নিয়েছিলেন। সেই বরটি হলো, যতদিন এই পৃথিবী থাকবে আর আকাশে উঠবে চন্দ্র সূর্য ততদিন যেন দেবতারা সকলে এই শিলায় অবস্থান করেন। আর এইস্থান যেন একটি পবিত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়। দেবতারা তাঁর কথা শুনেছিলেন। গয়াসুরের নামে গয়াতীর্থ হলোঃ শিবগয়া, নাভিগয়া, পাদগয়া। পাদগয়া এই পিঠাপুরমে। বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণীর উপকারের জন্য যিনি নিজের দেহটা পর্যন্ত দান করেছিলেন সেই আত্মোৎসর্গকারী পুণ্যাত্মা গয়াসুরের নামে চিহ্নিত হয়ে আছে ভারতের এই তিনটি তীর্থ-স্থান। পিঠাপুরম সেই তীর্থগুলিরই একটি অন্যতম তীর্থস্থান।

গোদাবরী

গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী গঙ্গা। একসময়ে গোদাবরীর পশ্চিম পারে কর্ব্বুর গ্রামে গৌতমমুনির আশ্রম ছিল। এখানে গোদাবরী অখণ্ড। মাইল তিনেক ধবলেশ্বরের কাছে সাতটি শাখায় বিভক্ত হয়ে এই নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। বারো বছর পর পর এখানে পুষ্করম্ স্নান হয়, হাজার হাজার যাত্রী আসে স্নানের জন্য। এখানে আছে মার্কেণ্ডেয় ও কোটি-লিঙ্গেশ্বর মন্দির। কিন্তু তার চেয়েও বিখ্যাত মন্দির আছে কোটিপল্লী দ্রাক্ষারাম ও ভদ্রাচলমে। দ্রাক্ষারাম হলো শিবের শশুর দক্ষ প্রজাপতির বাগান। এই দ্রাক্ষারামেই

ঘটেছিল বিরাট দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। অনেকে আবার এই দ্রাক্ষারামকে বলেন দক্ষিণকাশী। যাত্রীরা ভদ্রাচলম্ যাত্রা করে বৈশাখ মাসে। সুন্দর বিগ্রহ এই ভদ্রাচলম মন্দিরের। বিগ্রহ হলো রাম-সীতা আর লক্ষ্মণের। ধনুর্বান হাতে চতুর্ভূজ রাম ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে, পদ্ম হাতে সীতারও ত্রিভঙ্গ মূর্তি। এমন সুন্দর মূর্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। যাত্রীরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন এই বিগ্রহগুলোর দিকে।

কৃষ্ণা

কৃষ্ণা নদীর উৎস হলো মহাবালেশ্বরের উত্তরে সহ্যাদ্রি পাহাড়। সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচু উৎসের কাছে একটি মহাদেবের মন্দির আছে। তারপর মহারাষ্ট্র, মহীশূর আর অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত এই কৃষ্ণানদী স্থির মন্থরগতিতে বয়ে যাচ্ছে। শেষে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মহারাষ্ট্র, মহীশূর আর অন্ধ্রের প্রাণ হলো এই কৃষ্ণা। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা তাই এই নদীর জলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। কৃষ্ণা এদের কাছে গঙ্গা।

বিজয়ওয়াডার কাছে এই কৃষ্ণা নদীর ধারে পাহাড়ের উপর কনকদুর্গার মন্দির। সন্ধ্যারাতে অসংখ্য আলোকমালায় সজ্জিত এই মন্দির আমাদের মোহিত করে। মন্দিরের প্রশস্ত অঙ্গনে শান্ত পরিবেশ। দেবতার আরাধনার উপযুক্ত স্থান। কনকদুর্গার, মল্লেশ্বর ও বিজয়েশ্বর এই তিনটি শিবের মন্দির নিয়ে বিজয়ওয়াডা। পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দির আর নিচে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা কৃষ্ণা।

সমাপ্ত